পলিথিন

– শিফা রহমান

দীর্ঘ দিনের প্রেমের পর অনেক চড়াই–উৎরাই পেরিয়ে, অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের বিয়ে হয় ১৯৯৮–এর নভেম্বরে। বন্ধুরা আমাদের বলতো, আদর্শ প্রেমের জুটি। কারণ আমাদের প্রেম ছিল এলাকার মোটামুটি সবার জানা। দুই পরিবারের কঠোর বিরোধিতার মধ্যে আমাদের প্রেম যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তখন বন্ধুবান্ধবসহ আশপাশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদের ভালোবাসাকে বাচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

সে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তো তখন থেকে তার স্বপ্ন ছিল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হবে। এবং তারপর আমাদের বিয়ে হবে। সে যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল, তাই আমাদের প্রেম তার সার্থক পরিণতি পেতে চাকরি নামে সোনার হরিণের পেছনে ছুটে ক্লান্ত হয়নি।

বিয়ের পর আমি মায়ের কাছে থাকতাম। কারণ সামনে আমার বিএ ফাইনাল পরীক্ষা। তাছাড়া তার নতুন চাকরি, কাজেই আমাদের নতুন সংসার শুরু করার প্রস্তুতিতে তাকে কিছুটা সময় নিতে হচ্ছিল। সে প্রায়ই সপ্তাহের শেষে বাড়ি আসতো, মাঝে একদিন থেকে পরদিন চলে যেতো। তার যাওয়ার পর শুরু হতো দিন গোনা কবে বৃহস্পতিবার আসবে। এভাবেই দিন যেতো স্বপ্নের মতো করে।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে হঠাৎ একদিন বিকেলে আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে আমাকে মফস্বল শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডা. জানালেন এটি অ্যাপেনডিসাইটিস–এর ব্যথা এবং রোগীর অবস্থা এমন পর্যায়ে যে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করাই ভালো। না হলে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি এসে সে আমাকে খুলনাতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে একটি ভালো ক্লিনিকে আমাকে যতো শিগগির সম্ভব অপারেশন করাতে চায়।

দেশের দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চলে তখন বিরতিহীন পরিবহন ধর্মঘট চলছে। অবশ্য কিছু কিছু মাইক্রোবাস তখন আমাদের এলাকা থেকে অতিরিক্ত ঝুকি নিয়ে সাতক্ষীরা–খুলনা যাতায়াত করছে। আমাদের উপায় কি হবে?

ঠিক হলো পাশে আমার দূরসম্পর্কের খালামণির মাইক্রোবাসই হবে এ যাত্রায় আমাদের পরিবহন। কিন্তু সমস্যা হলো সোজা পথে যাওয়া যাবে না।

খালাতো ভাই বললো, আপা, আপনি রোগীর অভিনয় করবেন?

বললাম, অভিনয় কি রে? আমি তো রোগীই।

শান্ত বললো, আপনাকে রোগীর মতো লাগছে না তো তাই বললাম। তবে চিন্তা নেই, আমরা গ্রামের পথ ধরেই যাবো এবং গাড়িতে লাল পতাকা তো থাকছেই।

আমাদের দুজনের সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ছোট মামা, তার মামাশ্বশুর।

সকালে রওনা হয়ে খুলনা পৌছাতে সময় লাগলো প্রায় ছয় ঘণ্টা। স্বাভাবিকের থেকে দ্বিগুণের বেশি।

তখন রোজার মাস। ডিসেম্বরের শীত। খুলনায় পৌছে সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে পরের দিন সন্ধ্যায় আমার অপারেশন সম্পন্ন হলো। সাধারণ অপারেশন হিসেবে ডাক্তারের ভাষ্য অনুযায়ী পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লাগার কথা থাকলেও আমার বেলায় প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা সময় লাগে বিভিন্ন জটিলতার কারণে। ডাক্তার বেশ কয়েকবার পুনঃ পুনঃ অ্যানেসথেসিস দেন আমাকে যা ছিল যন্ত্রণাদায়ক।

ক্লিনিক থেকে নয়দিন পর বাসায় ফিরে তার চিন্তা কিভাবে আমাকে বাড়িতে রেখে আসবে? কারণ তখনো পরিবহন ধর্মঘট চলছে।

বললাম, আমি থাকি কয়েকদিন। ধর্মঘট শেষ হলে বাড়িতে যাবো।

কিন্তু সে আমাকে একদিনও রাখতে চায় না এই কথা শুনে আমারও জেদ চাপলো, থাকবো না, চলে যাবো। মাইক্রোবাসে গ্রামীণ পথে আসতে পারলেও যাওয়া সম্ভব নয় খুলনা থেকে। কেননা পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে এই নয় দিনে। এক মাত্র বিকল্প হিসেবে আমাদেরকে পানির বহন অর্থাৎ লঞ্চে করে যেতে হবে এবং সেভাবে বাড়ি পৌছাতে সময় লাগবে আঠারো ঘণ্টার মতো।

যাই লাগুক, মামাকে বললাম টিকেট কিনে আনতে। একদিনও থাকবো না।

মামা টিকেট কিনে আনলেন।

লঞ্চের মোট তিনটি ক্যাবিনের মধ্যে একটায় আমরা যাবো। রাত দশটায় লঞ্চঘাটে পৌছে দেখলাম বেশ বড় একটা লঞ্চ। বিয়ের পর প্রথম লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে। আমার মনটা কল্পনায় ভেসে গেল। লঞ্চে তখনো ওঠা হয়নি। বাস্তবতার মুখোমুখি তখনো হয়নি যেখানে কল্পনা শুরুতেই দারুণ হোচট খাবে। মামার কথা মতো লঞ্চে উঠে লঞ্চের সামগ্রিক স্পেসের তুলনায় অসংখ্য যাত্রী দেখে বিস্মিত।

এতো যাত্রী নিয়ে এই লঞ্চ গন্তব্যে পৌছাতে পারবে তো? অসংখ্য যাত্রী গায়ে গা ঘেষে দোতলা লঞ্চটির প্রত্যেক তলায় বসে আছে। দুই তলায় আমাদের ক্যাবিনটিতে সরাসরি যাত্রীর মধ্য দিয়ে খুব কষ্ট করে উঠতে হলো। প্রথমে মামা, মাঝখানে আমি, আমার পেছনে সে। এবং আমার এক পাশে তার একজন বন্ধু যিনি আমাদের লঞ্চ ঘাটে বিদায় জানাতে এসেছেন। এভাবেই মানুষের ধাক্কা বাচিয়ে কোনো মতে আমাকে ক্যাবিনে ঢুকিয়ে দিল।

লঞ্চ ভ্রমণের কথায় যে কল্পনা শুরু হয়েছিল, ক্যাবিনের টিকেট শুনে সে কল্পনা ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছিল নীল আকাশে। কিন্তু কল্পনা ছেড়ে বাস্তবের ক্যাবিনে ঢুকে মনে হলো মানুষের ক্যাবিন তো? নাকি জন্তু-জানোয়ারের ক্যাবিন?

ছোট বাশের মাচার ওপর ফোম পাতা তিনজন মানুষ হাটু মুড়ে শোয়া যায় কষ্ট করে। যখন প্রথমে বলেছিল, আমরা লঞ্চে বাড়িতে যাবো তখন মনে হয়েছিল, বড় একটা লঞ্চ হবে, শাদা ধবধবে যার সব কিছুই থাকবে শাদা, বিছানা-বালিশ থেকে টয়লেট পর্যন্ত। লঞ্চের ডেকে দাড়িয়ে পানিতে চাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবো, নদীর শীতল বাতাসে দূর হবে শরীরের সব ক্লান্তি। কিন্তু লঞ্চের সামগ্রিক পরিবেশ এবং ক্যাবিন দেখে স্বপ্ন হয়ে গেল দুঃস্বপ্ন এক মুহূর্তে।

লঞ্চ যখন চলতে শুরু করলো তখন বমি বমি লাগছিল, মাথাও ঘুরছিল।

সে বললো, শুয়ে পড়ো। ঘুমানোর চেষ্টা করো, ভালো হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পর শুরু হলো আসল বিপত্তি যখন আমি প্রস্রাব করার জন্য টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। ক্যাবিন লঞ্চের এক মাথায় আর দুর্ভাগ্যক্রমে টয়লেটের অবস্থান লঞ্চের ঠিক অপর মাথায়। ক্যাবিন থেকে মাথা বের করে দেখি ক্যাবিনের দরজা থেকে একপা ফেলারও জায়গা নেই।

সে একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে এলো। বললো, তুমি যেতে পারবে না কষ্ট করে ঘুমাও। তখন আর সমস্যা হবে না।

প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম ঘুমানোর। কিন্তু সময় যতোবেশি পার হচ্ছে, প্রস্রাবের তাড়া ততোবেশি অনুভব হচ্ছে। একটু পর পর তাকে বিরক্ত করতে লাগলাম।

সে বিরক্ত হয়ে বললো, এতো মহা যন্ত্রণা!

কি করা যায়, বুদ্ধি বের করো।

যা করার এই ক্যাবিনের মধ্যেই করতে হবে। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু সমস্যা হলো মামাকে নিয়ে।

তখন ভেবে-চিন্তে মামাকে বললো, মামা রাতে সেহরির কি ব্যবস্থা করা যায়?

মামা লঞ্চের মধ্যে কি ব্যবস্থা আছে তা দেখার জন্য ক্যাবিন থেকে বের হয়ে গেলেন।

এই অবসরে বললো, ব্যাগ থেকে পলিথিন বের করো।

পলিথিন দিয়ে কি হবে?

সে বললো, পলিথিন দিয়ে কি হবে, এখনো তা বুঝতে পারোনি? এটাই এখন হবে সর্বোত্তম টয়লেট।

সে আমাকে তাড়া লাগালো, দেরি হলে মামা চলে আসবেন।

আমার ততোক্ষণে প্রস্রাবের যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। আবার প্রচণ্ড লজ্জাও লাগছে। বাধ্য হয়ে তখন পলিথিনকে টয়লেট বানালাম। টয়লেট শেষে আরো কয়েকটি পলিথিন এক সঙ্গে দিয়ে মুখ বাধা হলো।

সে বললো এখন পলিথিন ব্যাগ নিয়ে ক্যাবিনের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। পেছনে যাত্রীদের চাপে পলিথিন ফেটে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আপাতত ক্যাবিনের মধ্যে এক পাশে ঝুলিয়ে রাখো এবং লঞ্চ মোটামুটি ফাকা হয়ে গেলে ফেলে আসা যাবে।

যাই হোক। তারপর শান্তিতে সেহরি পর্যন্ত ঘুমালাম। সেহরির সময় তারা লঞ্চ থেকে মাছের ঝোল ও ভাত নিয়ে সেহরি সারলো।

পরদিন থেকে দুই এক ঘাটে লোকজন নামতে শুরু করলো। আমরাও অপেক্ষায় আছি কখন এই বিপজ্জনক জিনিস থেকে মুক্তি পাবো। ক্যাবিন থেকে বাইরে বের হয়ে দেখছি যে, কোনদিকে কিভাবে ফেলা যায়!

এর মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঘাট এসে যাচ্ছে বলে মামা আমাদের জিনিসপত্র গোছানোর জন্য ক্যাবিনে ঢুকে গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি তাকেও যেতে বললাম। কিন্তু বিপত্তি যা হওয়ার তা ততোক্ষণে ঘটে গেছে।

মামা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাগ ভেবে প্রস্রাব ভর্তি পলিথিন ব্যাগ ধরে যেই না উচু করেছেন তখন দুভাগ্যক্রমে ওই বিকট দুর্গন্ধযুক্ত বের হয়ে তার সব শরীরে নিক্ষিপ্ত হলো।

নিশ্চয় বুঝতে পারছেন বেশ কয়েক ঘণ্টা পলিথিন ব্যাগে ধরে রাখা প্রস্রাব তখন কি বাজে বিশ্রী গন্ধ ধারণ করেছে। পরিস্থিতি যা হবার তা-ই হলো।

মামা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করলেন। কে জামাই, কে মেয়ে তা দেখার মতো পরিস্থিতি তখন তার নেই, থাকার কথাও নয়।

মামাশ্বশুরকে পরিস্থিতি বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে জামাই।

নতুন জামাইয়ের সামনে মামার এমন অগ্নিমূর্তি ধারণে প্রচণ্ড বিব্রত হলাম। মামাকে নানানভাবে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। মামা কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। পারলে আমাদের দুজনকে ধরে মার লাগায়। এর মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঘাট এসে যাওয়ায় আমরা ওই বিরূপ পরিস্থিতি থেকে সাময়িক রক্ষা পেলাম।

মামা জামা-কাপড় পাল্টে আমাদের পিছু নিলেন।

বাড়ি এসেই মামা তো মায়ের কাছেও এক চোট নিলেন।

মা সব শুনে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, মনে কর, মেয়ে এখনো ছোট আছে। জামা-কাপড় রেখে যা, আমি ধুয়ে পাঠিয়ে দেবো।

মামার অগ্নিমূর্তির চেয়েও আজও যে জিনিসটি বেশি করে ভাবি তা হলো, ওই পলিথিন কোনোভাবে ছিড়ে যদি সব প্রস্রাব পড়ে যেতো তাহলে লঞ্চের নিচ তলার যাত্রীরা আমাদের কি করতো!

সেদিন জীবনের প্রথম লঞ্চ ভ্রমণে মামার যে মুখশ্রী দেখেছিলাম, আজকের প্রবাস জীবনে তা মনে হলে যেমন প্রচণ্ড হাসি পায় তেমনি সম্ভাব্য বিপদের কথা ভাবলেও ভয়ে নীল হয়ে যাই।

ওকিনাওয়া, জাপান থেকে

ঝড়ে

– এমএম ওবায়দুর রহমান

১২ জুন ২০০৪। শাহবাগের জ্যামে আটকে আছি। এমন সময়ে মোবাইলে রিং এলো।

সিনথিয়া বললো, কেমন আছো?

বললাম, তোমাকে না দেখে যেমন থাকি তেমনি।

সে বললো, কবে আসবে?

বললাম, ইচ্ছা তো করছে এখনি চলে আসি। কিন্তু সামনে কোনো ছুটি নেই। এ মাসে আসতে পারবো না।

ওপ্রান্ত থেকে তখন না না অভিমান বার্তা শুনতে হলো।

শেষ পর্যন্ত বললাম, তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ কবে?

সে বললো, ১৫ জুন।

কলেজ গেটে আমাকে পাবে। বলেই লাইন কেটে দিলাম।

অনেক কষ্টে ছুটি ম্যানেজ করলাম। বাসায় এসে দেখি গ্রাম থেকে গেস্ট এসেছে। তাদের ম্যানেজ করে মাদারীপুর শিবচরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মাওয়া ঘাটে গিয়ে দেখি পদ্মায় প্রচণ্ড বাতাস। নদীতে লঞ্চগুলো বড় বিপজ্জনকভাবে দুলছে এদিক-ওদিক। কিছু লঞ্চে পানি উঠছে বাতাসের ঝাপটায়।

ফেরিঘাটে গেলাম। শুনলাম একটার আগে ফেরি নেই। অথচ একটার সময় সিনথিয়ার পরীক্ষা শেষ। ও গেটে দাড়িয়ে থাকবে। কি আর করা! জীবন হাতে রেখে লঞ্চে উঠলাম।

আমি হলাম ভীতু শ্রেণীর লোক। তাই লঞ্চ কিছু দূর যাবার পর যখন ঢেউয়ের সঙ্গে এদিক-ওদিক হেলে যাচ্ছিল, খুব ভয় লাগছিল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বিশাল পদ্মার দিকে। কি ভয়ংকর সুন্দর সেই দৃশ্য! তিন চার হাত উচু ঢেউ, প্রবল স্রোত। সব কিছু বিস্ময় নিয়ে দেখছি!

আকাশ ক্রমেই কালো হচ্ছে। এক সময় বাতাস বাড়লো, বাড়লো ঢেউয়ের উচ্চতা। লঞ্চের মানুষগুলোর চেহারা ক্রমেই অন্ধকার হলো। সবাই কেমন ভীতু ভীতু ভাব নিয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হলো। দুই হাত সামনের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছিল না।

নিশ্চুপ হয়ে গেল সবাই যখন শুনলো সারেং বৃষ্টির কারণে দিক হারিয়ে ফেলছে। বৃষ্টি এবং ঝড়ের তাণ্ডবে লঞ্চের অবস্থা খুবই খারাপ। মহিলারা চিৎকার করে কাদছে। কেউ কেউ নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে। আফসোস করে বলছে, কেন ফেরির জন্য দেরি না করে লঞ্চে উঠলো।

আমি ভাবছি সিনথিয়ার কথা। কতো সুন্দর নিষ্পাপ একটা মুখ! কি মায়া ভরা তার আচরণ। তার মতো এতো ভালো আর কেউ কোনোদিন আমায় বাসেনি। আমার জন্য তার ভালোবাসা ভরা আকুলতা আমাকে কি যে মুগ্ধ করে! ভাবছিলাম যদি চাদপুরের লঞ্চের মতো আমাদেরটা ডুবে যায় মন্দ কি?

একটা মায়াবতী মেয়ের ভালোবাসা বুকে নিয়ে পৃথিবী থেকে যেতে পারছি। এ মৃত্যু হবে আমার জন্য আনন্দ মৃত্যু। ভীতু টাইপের আমি বড় নিশ্চিত মনে বসে রইলাম। লঞ্চ কোনদিক যাচ্ছে, আমরা কেউ জানি না।

কান্নার শব্দে বাড়ছে। মহিলারাই কাদছে, পুরুষরা চুপ করে বসে আছে। ঘড়ির দিক তাকালাম। একটা পাচ মিনিট। আমি এই প্রথম তাকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না।

মোবাইলে রিং এলো। সিনথিয়া অভিমান ভরে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথায়?

বললাম, দিক হারা নাবিকের মৃত্যু জাহাজে আছি। জানি না তোমার কাছে ফিরতে পারবো কি না?

সে কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললো, এই ঝড়ের মধ্যে তুমি কি পদ্মায়? চারদিকে কান্নার শব্দ কেন?

বললাম, হ্যা আমি পদ্মায়।

তারপর সে কি বললো জানি না। বিশাল এক ঢেউ এসে ধাক্কা দিল লঞ্চকে। অনেক পানি উঠলো ভেতরে। ইঞ্জিনের গতিও যেন কমে আসছিল। বিকট শব্দ হলো। লঞ্চে কান্নার শব্দ বাড়ছিল। এক সময় বৃষ্টি কমলো। বাইরে তাকাচ্ছি কি অদ্ভুত ভয়ংকর সুন্দর পদ্মার রূপ! হঠাৎ খেয়াল করলাম এই ঝড়ের মধ্যে একটা ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে মাছ ধরছে এক জেলে। তার কাছ থেকে পাড়ের ঠিকানা নিল লঞ্চের ড্রাইভার।

এক সময় সব কিছু শেষ হলো। যাত্রীরা চোখ মুছে তীরে নামলো। বাইরে তখনো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। আমি একটা বেবিট্যাকসি নিয়ে ছুটলাম। দুইটার দিকে কলেজ গেটে গিয়ে দেখি সিনথিয়া দাড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। বৃষ্টিতে ভিজে শীতে কাপছে সে। আমি কাছে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

খোলা রাস্তার পাশে কলেজ। কতো লোক তাকিয়ে আছে। টের পেলাম তার চোখের গরম জল আমার পিঠ ভাসিয়ে দিচ্ছে। তাকে নিয়ে আমার এক বন্ধুর স্টুডিওতে গেলাম। তার জন্য নেয়া গিফটের প্যাকেট থেকে নতুন ড্রেসটা পরতে বললাম।

সে যখন নতুন ড্রেসে আমার পাশে ভেজা চুল নিয়ে বসলো তখন তাকে দেখলাম মুগ্ধ নয়ন ভরে। বললাম, তোমার তো ঠাণ্ডার সমস্যা। কেন এভাবে বৃষ্টিতে ভিজলে?

তার চোখ থেকে আবার জল পড়লো। বললো, তুমি না ফিরলে এখানেই মরে পড়ে থাকতাম। কেউ আমাকে এখান থেকে নিতে পারতো না। কেননা আমিই তোমাকে ঝড়ের এই দিনে আসতে বলেছিলাম। তোমার কিছু হলে এক সেকেন্ডও বাচতে পারবো না।

তার কান্না আবার বাড়লো।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

শিবচর, মাদারীপুর থেকে

বিবর্ণ

– মাসুম

ছয় বছর আগের কথা। ১৯৯৮ সাল। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। কলেজ ছুটি পেয়ে সিলেট থেকে জামালপুর আমার গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম।

যমুনা নদী আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিন চার কিলোমিটার দূরে। বাড়ির সঙ্গেই একটি বড় বাধ। এরপর যমুনার এক শাখা নদী। নদীর ওপারে আমাদের ফসলের মাঠ। ঠিক তারপরেই ছড়ানো–ছিটানো কিছু বাড়ি নিয়ে এক অবহেলিত গ্রাম। অবহেলিত এই কারণে যে, নদীর এপার আর ওপারের মাঝে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা পুরোপুরি ভিন্ন।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাধ দিয়ে হাটাহাটি করতাম। একদিন খুব ভোরে মানুষের কোলাহলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রতিদিনকার মতো সেদিনও বাধে গেলাম। অনেক মানুষের জটলা দেখেই বুঝতে পারলাম কোনো অঘটন ঘটেছে। বাধে গিয়ে দেখতে পেলাম নদীর ওপারের ফসলের উপর দিয়ে হাটু পরিমাণ পানি। দেখতে দেখতেই সারা দিনে পানি আরো বেড়ে গেল। বিকেলের দিকে ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা দেখতে পেলাম বাধে নোঙ্গর করা অবস্থায়। সব কিছু এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, বিশ্বাসই হচ্ছিল না গতকাল নদীর ওপারে ধানক্ষেত, আখক্ষেত ছিল।

রাতের দিকে আবারও কিছু মানুষের কোলাহল। একটি বড় নৌকা এসেছে বাধে। পাতিল, হাড়ি, জামা–কাপড়, ঘরের চাল, পাটখড়ির বেড়া, খাদ্যসামগ্রী অর্থাৎ একটি সংসারের প্রায় সব কিছু নৌকা থেকে নামানো

হচ্ছে। এরপর নেমে এলো আলুথালু গৃহবধূ, কোলে চার পাচ মাসের বাচ্চা, পাশে আরো তিনজন ন্যাংটো ছেলে, উদাসীন কংকালসার গৃহকর্তা। এরা নদীভাঙা। এদের বাড়ি যমুনার কবলে হারিয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম যমুনা এবার ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। বিঘার পর বিঘা জমি গিলে ফেলছে ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত যমুনা।

পরদিন সকালবেলায় নিজেকে আবিষ্কার করলাম পানির উপরে। ঘরের মধ্যে হাটু পরিমাণ পানি। পানি ভেঙে বাধে গেলাম। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দুইশ কিলোমিটার দূরে বাধ ভেঙে গেছে। কলকল শব্দে পানির ফোয়ারা এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমরা। চারদিকে শুধু ফেনা তোলা, কর্দমাক্ত, আবর্জনায় ভরা পানি আর পানি। রাতের ওই নদী ভাঙনের শিকার পরিবারটির মতো আরো দশ বারোটি পরিবার এসে গেছে ইতিমধ্যে।

আমাদের ঘরের মধ্যে যখন পানি কোমর ছাড়িয়ে গেল তখন বাধ্য হয়েই আমরাও ওই নদীভাঙাদের মতো বাধে আশ্রয় নিলাম। শুধু মা আর ছোট বোনটি থেকে গেল ঘরে। এক খাটের ওপর আরেক ঘাট বসিয়ে তার ওপর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। দুপুরের পর থেকে প্রবল বর্ষণ। মনে হচ্ছিল এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকলে সব শেষ হয়ে যাবে। বাধের পরিবেশও একদিনেই নষ্ট হয়ে গেছে। এতো মানুষের কোলাহল, গরু-ছাগলসহ গৃহপালিত জীবজন্তু, এদের মলমূত্র সব একাকার।

দুই তিন দিন পর আমার কিছু বন্ধু এলো নৌকা নিয়ে। সমস্ত গ্রামেই পানি। তারা এসেছে আমাদের দেখতে।

তাদের নৌকা নিয়েই বের হয়ে পড়লাম। গন্তব্য সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখা এবং সবার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা। সবাই কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছে। গত পাচ ছয় দিন আগেও যে মানুষটার চোখে মুখে আলোর আভা দেখেছিলাম। সে কেমন যেন আজ নিস্তেজ, অমাবস্যার অন্ধকার তাকে জাপটে ধরেছে। এর মাঝেও কলা গাছের ভেলা দিয়ে তারা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাচ্ছে, খাবার পানি সংগ্রহ করছে।

সমস্ত গ্রাম দেখার পর মূল নদীর দিকে যেতে চাইলাম। অনেকেই যেতে মানা করলো। বাবা মায়ের কাছে পাশের গ্রাম দেখার অছিলায় কয়েকজন মিলে বের হলাম। প্রায় দুই কিলোমিটার চলে এসেছি। প্রত্যেক বাড়িতেই পানি কোমর ছাড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো বাড়ির শুধু টিনের চালটুকু জেগে আছে। এরা কেউ পাশের বাড়িতে, কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে আবার কেউ আমাদের বাধে আশ্রয় নিয়েছে।

আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলাম। এক বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু এ কান্নার সুর অন্য রকম। নৌকা ভিড়ালাম সেই বাড়িতে। যা দেখতে পেলাম তা সত্যিই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক।

দশ বারো বছরের একমাত্র ছেলে মারা গেছে ডায়ারিয়ায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। খাবার স্যালাইনের প্রক্রিয়াও এরা জানতো না। এক অসহায় মা বিলাপ করে কাদছেন, বাবা নীরব-নিস্তব্ধ। বেশি আশ্চর্য হয়ে গেলাম মৃতুদেহ একটি কলা গাছের ভেলার ওপর শোয়ানো। পাশে শাদা কাফনের কাপড়, দুইশ টাকা, আগরবাতি এবং একটি সাবান।

জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কেন?

উত্তর পেলাম, সবখানেই তো পানি। কোথায় কবর দেবো? আমাদের চোখের সামনে তো একটা মানুষকে এভাবে পানির মধ্যে কবর দিতে পারি না। তাই মৃতদেহকে ভাসিয়ে দেবো। এই মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে যদি কোনো স্থলের সন্ধান পায় তাহলে সেখানকার মানুষরা কবর দেবে।

একজন বাবা, একজন মায়ের সামনে দিয়ে তাদের একমাত্র প্রাণপ্রিয় সন্তান এভাবে বিলীন হয়ে যাবে, স্থলে না পৌছাতে পারলে ভেলার ওপরেই কিংবা পানিতে পড়ে পচে যাবে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

বন্ধুরা তাড়া দিচ্ছিল বাড়ি ফিরতে।

সবাই উদভ্রান্ত, মর্মাহত। অনুরোধ করে তাদের কাছ থেকে কিছু সময় চেয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভেলাটি ছেড়ে দেয়া হলো।

বাবা সেই নির্জীব বস্তুর মতো দাড়িয়ে। চোখে মুখে হাহাকার। মায়ের কণ্ঠে বিলাপ। বার বার মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। সবার মাঝে একটা থমথমে ভাব। দূরে চলে যাচ্ছে তাদের প্রিয় সন্তান। আর কখনো মা ডাক শুনতে পাবেন না এই হতভাগিনী মা। তারা জানতেও পারবেন না কোথায় তাদের প্রিয় মানুষটির শেষ আবাসস্থল। এক মুঠো মাটি দেয়ার ভাগ্যও সৃষ্টিকর্তা এই হতভাগ্য বাবার কপালে রাখেনি।

মনের অজান্তেই কখন যে চোখে নোনাজল এসে গেছে টের পাইনি। আমি মারা গেলেও তো আমার বাবা–মা তাদের আদরের ছেলেকে এভাবেই ভাসিয়ে দিতেন। এরপর আর ওই বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নৌকা নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছি।

সেদিন সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। প্রচণ্ড ভয়ে জ্বর এসে গিয়েছিল। অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলাম পুরোপুরি। মাঝ রাতে নিজেকে আবিষ্কার করি খাটের ওপর। চোখ খুলে তাকাতেই দেখতে পাই পাশে মা বসে আছেন, হাতে জলপট্টি ।

নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না।

চট্টগ্রাম থেকে

যন্ত্রণায় তিন ঘণ্টা

– নিলুফার কবির

ছোটবেলায় যখন স্কুলে পড়তাম, নৌকা ভ্রমণ রচনা পড়ে নৌকা করে বেড়াতে যাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা হতো। কিন্তু আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যেতে নৌকার দরকার হতো না। রিকশা বা বাসে করেই বেড়াতে যেতাম।

বিয়ের পর আমার সেই ছোটবেলার ইচ্ছাটা পূরণ হলো। শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার বিঘা গ্রামে। ওখানে যেতে হলে হাজিগঞ্জ পর্যন্ত বাসে চড়ে তারপর টানা তিন ঘণ্টা নৌকা করে যেতে হতো। আকা–বাকা খাল–বিল, গ্রাম–গঞ্জের ভেতর দিয়ে নৌকা চলতো। আমি স্বামী দেবতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম নৌকায়। সে রাজ্যের গল্প জুড়ে দিতো, এমনি করে কখন যে তিন ঘণ্টা পার হয়ে যেতো টেরই পেতাম না। আমরা যখনই বাড়ি যেতাম, খাবার–দাবার নিয়ে নৌকায় বসেই খেতাম।

একবার কোরবানির ঈদ করতে বাড়ি গেলাম। শ্বশুর–শাশুড়ি, দেবর–ননদ সবাই এক সঙ্গে হই চই, মজা করে ঈদের দিনটা কাটালাম। পরদিন সকাল থেকেই মনটা কেন যেন হঠাৎ করেই খারাপ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। অজানা কোনো বিপদ ঘণ্টা মনে বাজতে লাগলো। আব্বা আম্মার কথা মনে হচ্ছিল বার বার। নানান রকম অশুভ কথা মনে উকি মারছিল।

সারা দিন এভাবে কাটানোর পর যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো ঠিক তখনই আমাদের বাড়ি থেকে কে যেন এসেছে খারাপ খবর নিয়ে। আমার চোখের আড়ালে সবাই কানাঘুষা করছে। কিন্তু কেউ–ই আমাকে কিছু বলছে না। আম্মা নেই এই ভেবে চিৎকার জুড়ে দিলাম।

শ্বশুর–শাশুড়ি বাড়ির সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিলেন কারো কিছুই হয়নি। আব্বার একটু শরীর খারাপ, তাই খবর দিয়েছে।

তখনি রওনা দেবো বলে আবদার জুড়ে দিলাম। কিন্তু কিভাবে রওনা দেবো? নৌকা ছাড়া ওখান থেকে বের হওয়া যাবে না।

আমার শ্বশুরআব্বা নৌকার মাঝিকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন।

খুব ভোরেই নৌকা এসে হাজির। রাতেই সবাই কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রেখেছিল। সারা রাত কান্নাকাটি করে এলোমেলো অবস্থায়ই নৌকায় এসে পা রাখলাম। এ নৌকা ভ্রমণই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণাময় নৌকা ভ্রমণ। সেদিনের তিন ঘণ্টা আমার কাছে মনে হয়েছিল ত্রিশ ঘণ্টার মতো। নৌকার মাঝি বৈঠা হাতে নিয়ে বসে আছে এমন মনে হলো আমার। নৌকায় বসে ছটফট করতে লাগলাম।

শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী দেবতা আমাকে পাশে বসিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

তাদের সেদিনের সান্ত্বনা আমার কাছে বিষের মতো লাগছিল। আমার মনে হয়েছিল, আমি যদি নৌকা থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে সাতার কাটতে পারতাম তাহলে মনে হয় তাড়াতাড়ি পৌছাতে পারতাম।

যথাসময়ে তিন ঘণ্টার নৌকার পথ শেষ হলো। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তারপর বাড়ি গিয়ে দেখি কেউই বাড়ি নেই শুধু কাজের লোক ছাড়া। গতকাল আব্বার স্ট্রোক হয়েছে। তাকে কুমিল্লা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সবাই আব্বার কাছে।

আমাদের বাড়ি থেকে কুমিল্লা শহর দুই ঘণ্টার পথ। পরদিন আমি পাগলের মতো ছুটে যাই হাসপাতালে। গিয়ে দেখি আমার আব্বা নীরব, নিথর দেহ নিয়ে শুয়ে আছেন হাসপাতালের বিছানায়। চিৎকার করে আব্বার কাছে গেলাম। আব্বা বলে কতো যে ডাকলাম! তিনি সাড়া দিলেন না। আব্বাকে জড়িয়ে ধরলাম। তার স্নেহের স্পর্শ মাখা হাত দুটি বুকে নিলাম। কেদে কেদে বুক ভাসালাম। আমার আব্বা চোখ খুলেও তাকালেন না।

এভাবে টানা চল্লিশ দিন থাকার পর আমাদের ছেড়ে আব্বা চিরবিদায় নিলেন। আব্বার শেষ কথাটুকু শুনতে পারিনি। শেষ স্নেহটুকু পাইনি এই কষ্ট নিয়ে বেচে আছি। হায়রে নৌকা ভ্রমণ!

সেদিন যদি গাড়ি থাকতো বা গাড়ির কোনো রাস্তা থাকতো তাহলে মনে হয় ছুটে যেতে পারতাম সময় মতো।

আজ তার বাড়ি যেতে নৌকার প্রয়োজন হয় না। রাস্তা হয়েছে। যেসব রাস্তায় নৌকা চলতো, এখন সেখানে গাড়ি, রিকশা, বেবিট্যাকসি সবই চলে। আমাদেরও গাড়ি হয়েছে। বাড়ির গারাজে গাড়ি রেখে ঘরে যাই। তারপর থেকে নৌকা ভ্রমণের কথা মনে হলেই অজানা এক বুক কষ্টে মনটা ভারী হয়ে যায়।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

রাস পূর্ণিমাতে

– মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন

সেই প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সম্প্রদায়রা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী *রাস পূর্ণিমা*-র মেলা বসায় দুবলর চরে। সুন্দরবনের কোল ঘেষে যাওয়া একটি চরের নাম দুবলর চর। সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বছরে একটি পূজা হয়। বহুলোকের সমাগম হয়ে এখানে। এমনকি বিদেশ থেকেও প্রচুর লোক আসে এখানে।

আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করলাম রাস পূর্ণিমার মেলায় যাওয়ার জন্য। কথা অনুযায়ী কাজ।

ইঞ্জিনচালিত ড্যানিশ বডির ট্রলার ঠিক করলাম দুইজন মাঝিসহ। যেতে একদিন, আসতে একদিন আর সেখানে থাকবো একদিন। মোট তিনদিনের জন্য চাল, ডাল, খাবার পানিসহ যার যার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে নিলাম। নির্দিষ্ট দিনে জোয়ার-ভাটা দেখে ট্রলার ছাড়লাম।

ট্রলার চলছে।

পাঠকবৃন্দ, এক মিনিট চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন আপনার ট্রলারটি নদীর বুক চিরে সামনে এগিয়ে চলছে। আপনি ট্রলারের ছাউনিতে দাড়িয়ে আছেন। বাতাসে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কি এক আনন্দে যেন শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এটা এমনি এক অনুভূতি যেটা প্রকাশ করা যায় না কথায়, না যায় লেখনিতে। তাই আপনাকেই এটা কল্পনা করে নিতে হবে। ট্রলার চলছে।

আমাদের ট্রলারটি নদীর মাঝ বরাবর দিয়ে চলছে। কেউ গান গাইছে, কেউ তাশ খেলছে, কেউ গল্প করছে, কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ রান্না করছে, কেউ আবার একা বসে নদী দেখছে, কবিতা লিখছে। মোট কথা সবাই অতীত ও ভবিষ্যৎ-এর সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে বর্তমান সময়ের আনন্দ চুষে নিচ্ছে।

প্রায় ছয় ঘণ্টা চলার পর সাত মোহনা পাড়ি দিয়ে ভাটার সময়ে সুন্দরবনের কাছে দুবলর চরে পৌছাই। তখন বিকাল পাচটা। কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে রাত আসবে। তাই সবাই মিলে হারিকেন, ল্যাম্প, টর্চলাইট, গ্যাসলাইট হাতের নাগালে রাখলাম। এর মধ্যে বহু ট্রলার আমাদের পাশে চলে এসেছে। রাতে সাগরে একটি ট্রলার আরেকটি ট্রলারের সঙ্গে গ্রাফি দিয়ে লাগানো থাকে যাতে করে কোনো ট্রলার কোনোভাবে ঝড়-তুফানে ছুটে যেতে না পারে।

আমরাও সেভাবে গ্রাফি দিয়ে থাকলাম।

প্রতিটা ট্রলারে নিভু নিভু প্রদীপ জ্বলছে। দেখলে মনে হয় যেন কোনো বেদের বহর বসেছে। রাতের নিস্তব্ধতা, কোথাও কোনো মনুষ্য কণ্ঠের আওয়াজ নেই। শুধু জঙ্গল থেকে নাম না জানা অচেনা অদেখা পশুর চিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙছে। আমাদের ভেতরে দুইটা গ্রুপ করলাম। প্রথম দল ঘুমাবে দ্বিতীয় দল পাহারা দেবে। রাত একটার পর দ্বিতীয় দল ঘুমাবে প্রথম দল পাহারা দেবে। এভাবে সকাল হলো আমাদের।

এরপর সবাই মিলে রাস পূর্ণিমায় অংশগ্রহণ করলাম। দেখলাম সবাই মিলে এক উৎসবে মেতেছে। সেখানে প্রচুর আনন্দ করলাম। আবারও সন্ধ্যা ঘুরে রাত এলো। গত রাতের মতো কাটলো এ রাতটিও। সকালবেলায় বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিলাম।

কিন্তু ট্রলার মাঝিরা বললো, এখন যাওয়া যাবে না। কারণ নদীতে জোয়ার। আমাদেরকে যেতে হলে সন্ধ্যায় ট্রলার ছাড়তে হবে।

আমরাও তাদের কথায় কোনো প্রতিউত্তর করলাম না। কারণ আমাদের থেকে তারা অনেক বেশি জানে নদী সম্পর্কে, পানি সম্পর্কে। তারা আকাশের চন্দ্র, সূর্য দেখে জোয়ার-ভাটা বলতে পারে। তাই আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। চিন্তা করলাম সন্ধ্যা সাতটায় রওনা হলে রাত বারোটা বা একটার ভেতরে বাড়ি পৌছাতে পারবো।

সারা দিন অপেক্ষা করার পর প্রায় রাত আটটার সময়ে ট্রলার ছাড়ালাম।

ভরা পূর্ণিমায় চাদের আলো করে পানির কোলে ঢলে পড়ছে। সবাই ট্রলারের ছাউনিতে বসে চাদের আলোয় স্নান করছি। সবাই খুব মজা করছি।

প্রায় ঘণ্টা দুই চলার পর আমাদের বেশ পেছন থেকে টর্চলাইট জ্বেলে আমাদেরকে থামানোর সিগনাল দেয়।

হঠাৎ সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ চিন্তা করলাম, ওটা নিশ্চয় ডাকাতের ট্রলার। তাই আমাদের ট্রলার মাঝিকে বললাম, তোমার এতোদিনকার ট্রলার চালানোর অভিজ্ঞতায় এবং ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদেরকে বাচাতে হবে।

ট্রলারচালকও প্রাণপণ চেষ্টা করছে আমাদেরকে বাচানোর জন্য। কিন্তু পেছনের ট্রলার ছিল আমাদের ট্রলারের চেয়ে দ্রুতগামী। তাই যখন দেখলাম নিশ্চিত আমরা ধরা খেতে যাচ্ছি তখন চিন্তা করলাম কি করা যায়! যদিও আমাদের কাছে তেমন কোনো মূল্যবান জিনিস নেই। তবুও ঘড়ি, চশমা, ক্যামেরা ও কিছু

টুকিটাকি জিনিস যে যেখানে পারলাম লুকিয়ে রাখলাম। একজন ভয়ে লুঙ্গি পরে মাথায় গামছা বেধে পানি ছ্যাচার ভান করে নিয়ে মাঝিদের সঙ্গে মিশে গেল। ইতিমধ্যে প্রায় আধা ঘণ্টা তাড়ানোর পর ধরে ফেলেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এরা ডাকাত নয়, নেভি বা নৌবাহিনীর সদস্য যারা নদী পাহারা দেয়। তারপর আমাদের ট্রলার তল্লাশি করে অবৈধ কোনো জিনিস না পাওয়ায় আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, সিগনাল দেয়া সত্ত্বেও না দাড়ানোর কারণ কি?

বললাম, আমরা ভেবেছিলাম আপনারা ডাকাত। কিন্তু এখন দেখছি আপনারা ডাকাত ধরেন।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের পরিচয় নিয়ে ছেড়ে দিল। যেন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সবাই খুব হাসাহাসি করছি। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আমাদের এক বন্ধু মন খারাপ করে কি যেন খোজাখুজি করছে।

সবাই জিজ্ঞাসা করাতে বললো, তড়িঘড়ি করে একশ টাকা যে কোথায় লুকিয়ে রাখলাম, এখন সেটা খুজে পাচ্ছি না।

শুনে সবাই হাসলাম এবং খুজলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি তার টাকাটা খুজেই পেলাম না।

আজও সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করি, টাকাটা তুই কোথায় রেখেছিলি।

সে বলে, আমার কিছুই মনে নেই। এসে যে কোথায় টাকাটা রেখেছিলাম আজও মনে করতে পারি না সে দিনের ঘটনা। সে কথা মনে পড়লে এখনো হাসি পায়।

সেদিন নৌপথ ভ্রমণে যেমন পেয়েছিলাম আনন্দ, তেমনি পেয়েছিলাম ভয়ও।

লালবাগ, ঢাকা থেকে

অমর

– নুরুল আমিন ইকবাল

১৯৮০ সালের শেষ দিকের কথা। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় দিন গুণছি। হঠাৎ করেই কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রি চিঠি এসে হাজির। প্রেসিডেন্ট জিয়া বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গভবনে সংবর্ধনা দেবেন এ আমন্ত্রণই শিক্ষা বোর্ডের চিঠির মাধ্যমে জানতে পারি।

চিঠি পেয়ে তো খুশিতে নাচছি এবং অপেক্ষায় দিন গুণছি। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো।

১ জানুয়ারি ১৯৮১–তে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলারের নেতৃত্বে আমরা বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বঙ্গভবনের সামনের বাগানে আমাদের বসার ব্যবস্থা।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আমাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চা নাশতা খেয়ে বিদায়।

কেমন যেন একটা অতৃপ্তি রয়ে গেল। এতো কাছে এসেও প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ভালো করে দেখা হলো না, কথা বলতে পারলাম না! কিন্তু এ অতৃপ্তি ছিল মাত্র কয়েকদিনের।

১৫ জানুয়ারি আবারও শিক্ষা বোর্ডের চিঠি। প্রেসিডেন্ট জিয়া কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে *হিজবুল বাহার*–এ তিন দিন সমুদ্র ভ্রমণ করবেন।

স্বপ্নের মতো মনে হলো। এর আগে নৌ ভ্রমণের তেমন স্মৃতি নেই। যদিও পরীক্ষার জন্য *জার্নি বাই বোট* অনেকবার মুখস্থ করেছি। উৎসাহ, উৎকণ্ঠায় দিন ঘনিয়ে এলো। ১৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম গিয়ে হাজির। স্টেডিয়ামে প্রেসিডেন্টের অন্য আরেকটি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আমাদের সবাইকে হিজবুল

বাহার জাহাজে নেয়া হলো বিকেলে। বিশাল জাহাজ। আমরা কয়েক বন্ধু জাহাজে গিয়েই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

সন্ধ্যার ঠিক আগে জাহাজের ডেকে গেলাম। সূর্যাস্ত দেখলাম। সবার মধ্যে কেমন যেন এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে ১৯৮০ সালের এসএসসি ও এইচএসসি-তে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্রছাত্রী ছাড়াও মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকেও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

২০ জানুয়ারি সকালে আমাদের সমুদ্র ভ্রমণ শুরু হলো। সে এক মনোরম দৃশ্য! আমাদের জাহাজ জেটি ছাড়ার পর আবারও ডেকে গেলাম। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি ফৃগেট এবং দুটি গানবোট আমাদের জাহাজের সঙ্গে। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের গার্ড অফ অনার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হবেই বা না কেন, আমরা যে প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রিত অতিথি!

বিশাল, সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে আমরা ছুটে চলেছি। এর যেন কোনো শেষ নেই। সবাইকে মনে হচ্ছিল কতো আপন, কতোদিনের চেনা। সত্যি সমুদ্র যেন তার বিশালত্ব দিয়ে আমাদের আপন করে নিল।

আনমনে সমুদ্র দেখছি। হঠাৎ দেখি জাহাজের ডেকে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জিয়া হাজির।

আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় হলো। বঙ্গভবনের অপূর্ণতা এবার পূর্ণতা পেল। প্রেসিডেন্টকে কাছে পাওয়া, কথা বলা, এক সঙ্গে ছবি তোলা, তাও আবার গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাহাজে! এ যে কি অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি তা বলে বোঝানো যাবে না।

জাহাজ চলার বিরাম নেই, যেন আমাদের যাত্রার শেষ নেই। সন্ধ্যার ঠিক আগে আবার সবাই জাহাজের ডেকে হাজির। এবার মাঝ সমুদ্রে চলমান জাহাজ থেকে সূর্যাস্ত দেখার দৃশ্য আমার মতো অনেকেরই জীবনে প্রথম এবং বিশেষভাবে মনে রাখার মতো অবিস্মরণীয় ঘটনা।

রাতে জাহাজের ডেকে বসে প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় বসলেন।

আমরা খোলাখুলি আমাদের সমস্যার কথা, বিশেষ করে ছাত্র বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাই।

প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাদের আশ্বাস দেন এবং সে বছর থেকেই ছাত্র বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া শুধু আশ্বাসের বাণী শুনিয়েই আমাদের খুশি করেননি, কার্যকর করে দেখিয়েছিলেন। সে জন্যই প্রায় দুই দশক পরে তখন ছাত্র বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানো হয়।

পরদিন প্রেসিডেন্ট আমাদের ব্রেকফাস্টে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানেও আমরা অনেক খোলামেলা আলোচনা করলাম যেখানে কোনো প্রটোকলের ঝামেলা ছিল না।

প্রেসিডেন্ট বললেন, আমাদের নিয়ে পরবর্তী প্রোগ্রাম হবে পাহাড় দেখা যা শুনে সবার হৃদয়ে প্রচণ্ড খুশির বন্যা বইছিল।

সেদিনের অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে প্রয়াত জাফর ইমামের কথা খুব মনে পড়ে। তিনি ছিলেন সেদিনের অনুষ্ঠনের কো-অর্ডিনেটর।

স্বপ্নের মতো যেন তিনটা দিন কেটে গেল। প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিলেন। আমরাও যার যার গন্তব্যে যাত্রা শুরু করি।

সে বছরই জিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু তিনি আমার হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

কুমিল্লা থেকে

শীতলক্ষ্যায় কিছুক্ষণ

– রুম্পা খান

রুমেল আমার কাজিন। পড়াশোনার পর্ব চুকিয়ে দেশের নামকরা একটা ওষুধ কম্পানিতে সে চাকরি করে। আমি তাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু বলা হয়নি কোনোদিন। তার দিক থেকেও সেই একই অবস্থা। নিটোল নিরন্তর অথচ অব্যক্ত আমাদের ভালোবাসা। কিন্তু দুজন দুজনের চোখের ভাষা পড়তে পারি, বুকের ভেতরের অস্থিরতা অনুভব করতে পারি। না দেখে থাকার কষ্ট যন্ত্রণার হিসাব কষতে পারি। কেবল মুখ ফুটে বলার অপেক্ষা।

একদিন সেই মধুক্ষণ এলো। ১৯৯৪ সালের কথা। রোজার ঈদের দুই দিন পর সে আমাদের বাসায় বেড়াতে এলো। দুপুরে সবাই এক সঙ্গে খেলাম। গাঢ় বেগুনি রঙয়ের জর্জেটের শাড়ি পরে, সেজেছিলাম মন ভরে যেন ঈদের দুই দিন পর আজ আমাদের সত্যিকারের ঈদ। বিকেলে রুমেলভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গেলাম নদীতে, নৌকায়। এ জন্য অবশ্য মাকে অনেক বোঝাতে হয়েছে।

আমাদের বাসা থেকে সামান্য দুরেই শীতলক্ষ্যা নদী। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য একটা নৌকা ভাড়া নিয়ে আমরা মাঝির দিকে পেছন করে বসে পড়লাম। সামনে যতো দূর চোখ যায়, পানি আর পানি। উপরে অবারিত আকাশ। মাঝির বৈঠার ছলাত-ছলাত শব্দ কি যে ভালো লাগছিল সে কথা বুঝিয়ে বলার মতো নয়!

ভালো লাগাকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিল তার খুব কাছাকাছি বসে থাকা। মনে হচ্ছিল সময়টা খুব দ্রুত সরে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে এলো।

বললাম, মা সন্ধ্যার আগে ফিরতে বলেছেন।

রুমেলভাই আমার ডান হাতটা তার দুই হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলেন।

নদীর পানির মতোই আমার দেহ-মন তরল হয়ে এলো যেন অবশ হয়ে এলো সব, যেন ভিজে চুপসে এতোটুকু হয়ে গেছে আমার পৃথিবী। বুকের ভেতরের এই আলোড়ন তাকে বুঝতে দিইনি। নিজেকে সংবরণ করেছি খুবই ধৈর্যের সঙ্গে।

সে গাইলো –

এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়

একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু...

আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল এ শীতলক্ষ্যার বুকে এই সুন্দর সন্ধ্যাটা যদি কোনোদিন শেষ না হতো! কিন্তু সন্ধ্যাটা বড্ড ক্ষণস্থায়ী। অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। দূরে কোথা থেকে এশার আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। আমি মাথায় শাড়ির আচল টেনে দিলাম। বললাম, চলো বাসায়। অন্ধকারে নদীতে কেমন ভয় লাগছে।

রুমেল আমার ঘোমটা সরিয়ে চোখে চোখ রেখে বললো, রুম্পা, আমার তো মনে হয়, তুমি আমার হাতে হাত রেখে, বুকে মাথা রেখে নির্ভয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে সারাটা জীবন। সে জীবন নদীতে হোক কিংবা পাহাড়েই হোক।

বললাম, এতো বিশ্বাস কিসের?

বললো, ভালোবাসার।

নৌকা ঘাটে ভিড়লো। আমি গভীর বিশ্বাসে তার হাত ধরে ঘাট থেকে বাসায় ফিরে এলাম। ধন্যবাদ শীতলক্ষ্যার বুকে নৌকা ভ্রমণ। কারণ সেই যে হাত ধরেছি দুজন দুজনের, আর ছাড়িনি। বিয়ে করে আমরা সুখী।

চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে

চেকপোস্টে

– সাজেদা হোসেন

সময়টা ১৯৭১ সালের এপৃল মাসের শেষের দিক হবে। সমস্ত ঢাকা নগরীর বাতাস বিষাক্ত হয়ে আছে গোলাবারুদ এবং গলিত লাশের গন্ধে। দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে। ঢাকা শহর প্রায় খালি হয়ে এসেছে।

আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া ঊনিশ বছর বয়সের এক তরুণী। একমাত্র ভাই প্রকৌশল ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র এক টগবগে তরুণ। ২৫ মার্চের পর থেকে মা–বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না এ দুই ছেলেমেয়ের জন্য। গ্রামে আমাদের তেমন কোনো বন্দোবস্ত না থাকায় ঢাকাও ছাড়তে পারছিলাম না। তাছাড়া বাবা সরকারি চাকরি করতেন। তার বেতনের টাকাটিই ছিল আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

ঢাকার দক্ষিণে অবস্থিত আমাদের এলাকাটি বেশ নিরাপদই ছিল প্রথম দিকে। মাস খানেক তো লুকিয়ে কাটিয়ে দিলাম দুই ভাইবোনে। কিন্তু শেষে আর লুকানোর জায়গাও রইলো না। বেশির ভাগ আত্মীয়স্বজনই ততোদিনে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন বা ছাড়বো ছাড়বো করছেন। তারপরও এক রকম কাটিয়ে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু যেদিন রাতে আর্মিরা আমাদের পাশের বাসার দরজা ভেঙে বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল সেদিনই আমাদের সাহসের তিলমাত্রও অবশিষ্ট থাকলো না। তখনই মা–বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের আর শহরে রাখা ঠিক হবে না।

এর একদিন পরেই আমরা দুই ভাইবোন, এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও তার স্ত্রী এবং তার দুই নাবালক ছেলেমেয়ে, সবাই এক সঙ্গে গ্রামে যাবো ঠিক করা হলো।

আমারও আর ভালো লাগছিল না এভাবে বন্দী জীবন কাটাতে। দিনের বেলা বাগানে যাওয়া তো দূরের কথা, বারান্দাতেও বের হওয়া যেতো না। ঘরের ভেতরে জানালা দরজা বন্ধ করে থাকতে হতো। জোরে কথা বলাও নিষেধ। গান–টান শোনা তো দূরের কথা, রাতের বেলা অন্ধকারে বসে আকাশের তারা গোনা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বিজলি বাতি জ্বালানো তো ভুলেই গিয়েছিলাম।

ছাত্র পরিচয় মুছে ফেলার জন্য বইপত্র সব লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। কেবল প্রাণটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনবেলা খাদ্য–অখাদ্য কোনো মতে গলা দিয়ে নামিয়ে দেয়া। জীবন্মৃত আর কাকে বলে! তাই আসন্ন মুক্তির আশায় মনটা নেচে উঠলো।

পরদিন খুব ভোরে আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমার পরনে রঙচটা পুরনো শাড়ি আর বোরখা। ভাইয়া লুঙ্গি–শার্ট। এবং সঙ্গে কাপড়ে বাধা গাটরা ও ধ্যাবড়ানো চামড়ার সুটকেস। পথে ওটার হাতল ছিড়ে যাওয়ায় ঘাড়ে নিতে হয়েছিল।

শিক্ষক পরিবারের বেশ–বাসও একই রকম। বেশ কিছু অলিগলি হেটে ঘুর পথে নদীর ঘাটে পৌছালাম। এখান থেকেই নৌকায় উঠতে হবে। এ নৌকাই আমাদের মাঝ নদীতে দাড়িয়ে থাকা লঞ্চে তুলে দেবে। তখন আর্মির ভয়ে সদরঘাট দিয়ে কেউ–ই ঢাকা ছাড়তে পারতো না।

ঘাটে পৌছে দেখলাম পলায়নরত মানুষের ঢল নেমেছে। অনেক কষ্টে দুটো ছোট কোষা নৌকা জোগাড় হলো।

এগুলো দেখেই আমার হাটু কাপা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই আল্লাহর নাম নিয়ে এগুলোর একটাতেই উঠে বসলাম অনেক কসরত করে। বিলম্বে এ দুটোও হাতছাড়া হয়ে যাবে যে!

ধীরে ধীরে ডিঙি দুটো চলা শুরু করলো। পিছিয়ে যেতে লাগলো ঘাট আর ঘাটে দাড়িয়ে থাকা ক্রন্দনরত জাফরচাচা। এক সময় নৌকা বাক নিতেই সফেদ শুশ্রূমণ্ডিত জাফরচাচা চোখের আড়ালে চলে গেলেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, ডুকরে উঠলাম।

জানি না কোনোদিন আর ফিরে আসতে পারবো কি না। পেছনে পড়ে রইলো আমার মিনি বেড়াল এবং তার সদ্যজাত চারটি উলের বলের মতো বাচ্চা। পড়ে রইলো আমার আদরের লাল মোরগ টুপটুপ। রোজ সন্ধ্যায় বাগান আলো করে ফুটে থাকবে সন্ধ্যামালতিরা। এবং রাতের বাতাস মাতিয়ে রাখবে সদ্য ফোটা বেলি ফুলেরা তাদের তীব্র সুগন্ধে। সেগুলো সযত্নে তুলে নেয়ার মানুষই কেবল থাকবে না। বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছে।

নদী ক্রমেই চওড়া হচ্ছে। আশপাশের বড় নৌকার ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের ডিঙি দুটো ভীষণ দুলছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি উল্টে গেল। কোনো মতে নৌকার কানা দুটো ধরে চোখ বুজে আছি। বুকের কাপুনি বেড়েই চলেছে। সাতার জানি না আমরা কেউ–ই।

এক সময়ে নৌকা ভিড়লো নদীর মাঝে থেমে থাকা লঞ্চের গায়ে। কিন্তু সেখানেও মুসিবত। লঞ্চে উঠতে হবে জানালা দিয়ে।

শাড়ি বোরখায় জড়ানো আমাকে পার্সেলের মতো তুলে দেয়া হলো জানালা গলিয়ে। কোনো মতে গাদাগাদি করে একটু বসার জায়গা পেলাম। বসতে না বসতেই লঞ্চ ছেড়ে দিল। তখনো ধেয়ে আসছে নৌকা ভর্তি অসংখ্য মানুষ। কিন্তু তিল ধারণেরও স্থান নেই ভেতরে। হাত নেড়ে লঞ্চ থামাতে বলছে অনেকেই। তা আর সম্ভব হলো না।

বুড়িগঙ্গা পার হয়ে লঞ্চ ধলেশ্বরীতে পড়লো। ভেতরের মানুষজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সবাই এবার তাদের পোটলা–পুটলি খুলে খাবার–দাবার বের করলো। অতো ভোরে প্রায় সবাই অভুক্ত অবস্থায়ই রওনা হয়েছিল। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস ক্ষিধে তৃষ্ণার বোধটাই যেন মরে গিয়েছিল।

ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে লঞ্চ চলছে মেঘনা নদীতে। প্রায় সবাই ঝিমুচ্ছে, কেউ কেউ ঘুমিয়েও গেছে হেলান দিয়ে।

২৫ মার্চের সেই কালো রাতের পর থেকে তো ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঢাকাবাসীদের। লঞ্চের ভেতরে ঝিম ধরা নীরবতা, কেবল ইঞ্জিনের একটানা ভট ভট শব্দ। আচমকা শব্দ থেমে গেল। নড়েচড়ে উঠলো সবাই। উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক–ওদিক তাকাচ্ছি সবাই। তখনই শুনলাম ভয়ংকর কথাটি।

নদীতে আর্মির চেকপোস্ট বসেছে। আমাদের লঞ্চ থামানো হয়েছে। লঞ্চ সার্চ হবে।

সারেং আর সুকানি কাপতে কাপতে নেমেছে কাগজপত্র নিয়ে।

পাথর হয়ে গেলাম সবাই। রক্ষা নেই। লঞ্চের ভেতরে পিনপতন নীরবতা। সবাই মনে মনে দোয়া–দরুদ পড়ছে। মায়েরা বাচ্চাদের মুখ চেপে ধরে বসে আছে রক্ত শূন্য চেহারা নিয়ে। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসছে আমার। মাঘ মাসের তীব্র শীত অনুভব হচ্ছে গায়ে। জানি না কি পরিণতি অপেক্ষা করছে। মৃত্যুর চেয়েও যে পরিণতি অনেক ভয়ংকর।

বোরখার মুখাবরণের আড়াল থেকে দেখলাম ভাইয়ার মুখ নীল হয়ে উঠেছে, হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ। জানি এই মুহূর্তে ভাইয়া নিজের নয়, আমার জন্যই অস্থির।

সবাই অপলকে চেয়ে আছি এই বুঝি উঠে এলো যমদূতেরা। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। যদিও চিন্তা শক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে তবুও ঠিক করে ফেললাম, বেগতিক দেখলেই নদীতে ঝাপ দেবো। সেই মুহূর্তে মেঘনার ঘোলা জলকে বড় আপন মনে হলো।

হঠাৎ করেই লঞ্চের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। লঞ্চ চলা শুরু করেছে কোনো অঘটন ছাড়াই। আর্মিরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে বিনা সার্চেই।

অলৌকিক ঘটনাই বলতে হয়। ধীরে ধীরে সবাই যেন প্রাণ ফিরে পেল।

কেউ কেউ বললো, চেকপোস্টের পাশে বাশের সঙ্গে বাধা অবস্থায় বেশ কয়েকটি লাশ পানিতে ভাসছিল।

শিউরে উঠলাম আবার সবাই। আল্লাহতাআলার অশেষ মেহেরবাণীই বলতে হবে।

লঞ্চ এবার পদ্মা নদীর রূপালি স্রোত কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। বৈশাখ মাসের বেলা শেষের রোদ চলকে যাচ্ছে গাঙ চিলের শাদা ডানায়। ঘণ্টা খানেক এভাবে চললেই পৌছে যাবো কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। তারপর কেবল মাইল খানেক হাটা পথ।

মুক্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক খালি করে।

খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা থেকে

মহাশ্মশান

আমাদের স্কুলটি যে গ্রামে অবস্থিত, আমার বিচারে সেটি একটি আদর্শ গ্রাম। সকল ধর্মের, সকল পেশাজীবীর অপূর্ব সম্মিলন অন্য কোনো গ্রামে দেখিনি। এখানে স্কুল, বাজার, ইউপি অফিস, পরিবার কল্যাণ অফিস একই কমপ্লেক্সে অবস্থিত। এবং এর সামনে দিয়েই কপোতের চোখের জলের মতো আশ্চর্য সুন্দর স্বচ্ছ জলধারা নিয়ে কপোতাক্ষ ছুটে চলেছে। আমাদের স্কুলের খেলার মাঠের সামনেই নদী। খেলতে খেলতে কতোবার যে নদীতে বল পড়ে গেছে তার হিসাব নেই। তো এমনই এক ঘটনা।

তখন আমি ক্লাস টেনের ছাত্র। আমার একটা শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গোলপোস্টের বাম পাশ দিয়ে একেবারে নদীতে। শাস্তি স্বরূপ আমাকেই বল আনতে হবে। আর তখনই শুনি *মাগো* বলে চিৎকার এবং নদীর ঘাটে মহিলাদের চিৎকার। গিয়ে দেখি শাড়ি পরা অল্প বয়সী এক মেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

কয়েকজন আমার ওপর আক্রমণ করে বললেন, কে বল মেরেছে বল।

আমি কিছু বলার আগেই কয়েকজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিল। সেই সময় দেখলাম বলটি স্রোতে ভেসে বেশখানিক দূর চলে গেছে। খেলার নেশায় সব কিছু ভুলে বল আনতে ছুটলাম। দক্ষ সাতারু হিসেবে বল নিয়ে অন্য পথে মাঠে ফিরে এলাম। এবং খেলায় মেতে উঠলাম। খেলা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বার বার মনে পড়ছিল ওই মেয়েটির কথা। অনুশোচনা হচ্ছিল, কেন খেলা ফেলে তার খোজ নিলাম না!

কিছু দূর আসার পর এক বাড়ির মহিলারা আমাকে দেখিয়ে বললেন, *এই সেই ছোড়া*।

তাদের ভাবগতিতে ভয় পেলেও সেই মেয়েটিকে মহিলাদের সঙ্গে দাড়িয়ে থাকতে দেখে অনেক ভালো লাগলো। তাদের কাছে আমার অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য ক্ষমা চাইলাম।

বাড়ি ফিরে ওই মেয়েটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। এরপর স্কুলে যাওয়া–আসার পথে ওই বাড়িতে আমার যাতায়াত বেড়ে গেল।

ওই চাপাফুলের মতো রঙের জ্যোৎস্না নামের মেয়েটির কারণে আমার পড়াশোনার কিছুটা ক্ষতিও হলো। তারই প্রস্তাবে একদিন রাতে শুরু হলো আমাদের দুঃসাহিক নৌকা ভ্রমণ। পরিকল্পনা মোতাবেক সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাট থেকে জেলেদের নৌকা চুরি করলাম। তাদের নৌকার পাটাতনের বাশের ফালি খুলে বৈঠা বানালাম।

তখন নদীতে স্রোতের বেগ খুব বেশি না। তবুও নৌকা স্রোতে ভাসিয়ে দিলেই অনেক দূর যাওয়া যায়। আমি বৈঠা হাতে আর সে আমার কোলে শুয়ে শুয়ে কতো গল্প বলছে। আমরা দুজনে কতো স্বপ্ন দেখছি। এমন সময় আকাশে চাদ উঠলো। আহ, সে যে কি মধুর দৃশ্য!

জীবনে ভোলার নয়।

ততোক্ষণে বৈঠা ছেড়ে নৌকার মাঝখানে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। জ্যোৎস্নার এমন রাতে তাকে যথার্থই জ্যোৎস্নার বলেই মনে হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে আবেগ সামলানো কঠিন।

তাকে কাছে টেনে নিলাম।

সেও এমন মধুর রাত বিফলে যেতে দিতে রাজি হলো না।

কিন্তু নৌকা ততোক্ষণে শ্মশানঘাটে পৌছে গেছে। শ্মশানচারী শিয়ালের ডাকে ভয় পেয়ে আমাকে সে ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরলো। আমি অভয় দিলেও সে ছাড়ে না।

এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। খেয়াল হলো রাত অনেক হয়েছে, বাড়ি ফিরতে হবে। হিসাব করে দেখলাম নৌকা ততোক্ষণ অনেক দূরে চলে গেছে।

তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বৈঠা পানিতে পড়ে গেল। আরেকটা বাশের ফালি খুলে নিলাম।

সে বললো তাকেও একটা দিতে। তাহলে কিছুটা হলেও সে সাহায্য করতে পারবে।

তাকে কাছ ছাড়া করতে চাইলাম না। কিন্তু ঈশ্বর হয়তো রাজি ছিল না।

তাকে জোর করে রাখতে চাইলে সে জোরাজুরি শুরু করলো। আমার এক হাতে বৈঠা রেখে নৌকা ঠিক রাখতে হচ্ছিল।

হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হলো। আমিও লাফ দিয়ে পড়লাম। কিন্তু শ্মশানঘাটের জায়গাটা ছিল দামলতা–কচুরিপানায় ভরা। অনেক খুজেও তাকে পেলাম না। প্রচণ্ড ভয় পেলাম। হায় ঈশ্বর! এ আমি কি করলাম! আমি নিশ্চিত যে, বাড়ি থেকে বের হবার সময় কেউ আমাদের দেখেনি। জানাজানি হলে নিশ্চিত আমার ফাসি হবে। একা কাদতে লাগলাম।

এক সময় বাড়ি পৌছালাম। রাতে ঘুম হলো না। শুধু মনে হচ্ছে এ কি করলাম!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বেশ বেলা হলে ঘুম ভাঙলো।

আরেকটু বেলা হলে শুনলাম, ও পাড়ার বিপিন বাড়ৈ–এর বাড়িতে যে মেয়েটি বেড়াতে এসেছিল তাকে শ্মশানের পেতনি ঘাড় মটকে শ্মশান তলায় মেরে ফেলেছে। জলের ধারে তার লাশ পাওয়া গেছে।

সেদিন রাতে অনেক্ষণ জলে ভিজে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছিল। পরে সেটা অ্যাজমায় রূপ নেয় যার দুর্বিষহ যন্ত্রণা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। মহাশ্মশানের চিতার চেয়েও আমার ভেতরে এক অশান্ত চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে। ভালোই হচ্ছে। পাপের কিছুটা তো প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পেপসির ক্যান

– মুয়াম্মার আল মিসবাহ

১৬ মে ২০০৪। আমি আর আমার ছোট ভাই অর্পো নৌযাত্রার জন্য বের হলাম। সঙ্গে নিলাম চকোলেট, চিপস এবং আমার জন্য একটা পেপসির ক্যান।

আগেই বলে রাখাটা ভালো যে, এই নৌযাত্রাটি আমার জন্য প্রথম নৌপথের অভিজ্ঞতা ছিল। অবশ্য কেউ সেটা জানতো না। কারণ আমার বাবা–মা কেউ তখন আমার সঙ্গে ছিলেন না। আমি এবং অর্পো এখানে বেড়াতে এসেছি। ঠিক করেছি যে নদীর ওই পারে এক শিশু পার্কে যাবো। ওই পারে ছোটদের বিনোদনের জন্য সম্প্রতি সামান্য কিছু আয়োজন নিয়ে একটা পার্ক তৈরি করা হয়েছে।

যাত্রা শুরু হলো। অর্পো বিচলিত ও সামান্য ভীত। আমিও কম যাই না। নদীর যেই পারের দিকে গেলে পার্ক পাওয়া যাবে সেদিকেই নৌকা চলতে লাগলো। আমরাও খুব মজা করতে লাগলাম।

এক পরিস্থিতিতে অর্পোকে কেমন যেন গম্ভীর দেখাতে লাগলো।

বললাম, কিরে অর্পো। চুপ মেরে গেলি যে?

অর্পো চুপ থাকলো। খানিক বাদে বললো, ভাইয়া, পেসু করবো। মাঝি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, *তাইলে নদীতে কইরা লাও*।

না। অর্পোর উত্তর।

বেশ তো! নৌকাতে করবি। উপায় না দেখে আমার উত্তর এটাই হলো। তা না হলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলতে পারে।

না, করবো না। ভাইয়া, খুব!

হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

আমার হাতের পেপসি ক্যানকে এক নিঃশ্বাসে সাবাড় করে ফেললাম। তারপর অর্পোকে তাতে পেসু করালাম। কিছুক্ষণ পর আমরা নৌকা থেকে নেমে পড়লাম।

গন্তব্যস্থলে পৌছানোর পর মনে হলো যে, অর্পোর ক্যানটা আমার হাতেই। উপায় না দেখে ক্যানটা বেঞ্চের ওপর পার্কের এক কোনে রেখে দিলাম। অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর ক্যানটার দিকে লক্ষ্য করতেই দেখি একটা ছেলে (সম্ভবত টোকাই) ক্যানটাকে ঝোলার ভেতর ঢোকাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটাকে সাবাড় করে দিল।

এই ঘটনা দেখে হাসবো, না কাদবো, নাকি ছেলেটাকে বলবো বুঝে উঠতে কষ্ট হলো। কিন্তু ছেলেটাকে বলার কষ্ট করতে হলো না। সে বুঝে গেল ক্যানটায় কি ছিল।

রামপুরা, ঢাকা থেকে

পেনাংয়ে

– পলক

ঘটনা ১৯৯০ সালের কোনো এক সময়ের। সঠিক তারিখ আমার মনে নেই।

আমি নৌবাহিনীর একজন নাবিক। সবেমাত্র বেসিক ট্রেনিং শেষ করে ফ্রিগেটে বদলি হয়ে এসেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমার এ জাহাজই মালয়শিয়ায় যাবে। উদ্দেশ্য International fleet review-তে যোগ দেয়া। মালয়শিয়ার পেনাং বন্দরে এই আন্তর্জাতিক রিভিউ অনুষ্ঠিত হবে।

যথাসময়ে জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়লো এবং মালয়শিয়ার পেনাং বন্দরের কাছে নোঙ্গর করলো। আমাদের জাহাজ ছাড়াও প্রায় ত্রিশটি দেশের রণতরী এই আন্তর্জাতিক রিভিউ-তে যোগ দিয়েছে।

একদিন সকালে শাদা ইউনিফর্ম পরে জাহাজ থেকে লিবার্টি আসি পেনাংয়ে। পেনাংয়ের পথঘাট সবই অচেনা। তবুও কোনো সমস্যা নেই। কারণ ওই দেশের পুলিশ প্রশাসন সর্বদাই আমাদেরকে গাইড করছে। এছাড়াও গাইড বুক দিয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাই নির্ভয়ে পথ চলো নীতি অনুসরণ করে হেটেই চলেছি।

আমার স্বভাব একা চলা। একা চলতে চলতে ক্লান্তি অনুভব করি। মার্কেটের অনতিদূরে রাস্তার পাশে আইল্যান্ডে বসে সিগারেট টানছি। সেই মুহূর্তে শ্যামলা বর্ণের লম্বা পাচ ছয় ফিট সুন্দর মায়াবী মুখের অধিকারিণী মিনি স্কার্ট পরিহিত মেয়েটি কাছেই এসে বসলো।

আমি একটু ভাব নিয়েই সিগারেট টানছি এবং মেয়েটিকে ফলো করছি। পাচ দশ মিনিট পর মেয়েটি সরাসরি ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি বাংলাদেশি?

বললাম, হ্যা। তুমি?

তখন মেয়েটি বললো, অরিজিনালি আমরা সাউথ ইনডিয়ান। কিন্তু এখন মালয়শিয়ার নাগরিক।

তখন বললাম, তুমি কি হিন্দি জানো?

মেয়েটি বললো, *থোরা থোরা*।

তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম হিন্দিতে, *তোমকো নাম কেয়া হ্যায়?*

আমি হিন্দি ভালো জানি না।

মেয়েটি এক গাল হেসে বললো, *মেরে নাম স্মৃতি রহমান হ্যায়*।

তারপর অনেক কথা হলো। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি বিবাহিত কি না? তুমি কি করো? তোমার এখানে কে আছেন ইত্যাদি।

মেয়েটি অবিবাহিত। ম্যানেজমেন্ট অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়ে। মা-বাবা আর এক ভাই ছোট। মোটামুটি সুখের সংসার।

মেয়েটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কেনাকাটা করছিল এবং বললো, তুমি ঠিক এই সময়ে আগামীকাল এসো, তোমাকে অনেক দর্শনীয় স্থান দেখাতে নিয়ে যাবো এবং আমার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

আমি বিদায় নিয়ে জাহাজে চলে এলাম ঠিকই কিন্তু কেন জানি মনটা পড়ে রইলো স্মৃতির কাছে।

পরের দিন অতি কষ্টে স্যারদের বলে (যেহেতু ডিউটি ছিল) জাহাজে থেকে চলে আসি। গিয়ে দেখি স্মৃতি গাড়ি নিয়ে আগেই এসে অপেক্ষা করছে।

আমাকে দেখেই রেগে বললো, দেরি কেন বন্ধু?

কথা না বাড়িয়ে সরি বললাম। স্মৃতি *ইটস ওকে* বলে গাড়িতে ওঠার জন্য অনুরোধ করলো।

ভয় এবং আনন্দ নিয়ে তার সঙ্গে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

স্মৃতি আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো, মাই হাউস, আমার বাড়ি।

চুপচাপ বসে গাড়ির ক্যাসেট শুনছি। ইংরেজি গান, ভালোবাসার কথা তেমন বুঝি না। তবে লাভ কথাটা বুঝতে পারছি।

স্মৃতি আমাকে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি চিন্তিত?

কষ্টে হেসে বললাম, কখনোই না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, বিয়ে করেছো? তোমার কি কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে?

বললাম, আমি অবিবাহিত। গার্লফ্রেন্ড ছিল। কিন্তু সে এখন মৃত বলে চুপ মেরে গেলাম। গাড়ি স্মৃতির বাড়ির গেটে এসে গেছে। তাই কোনো কথা বলার অবকাশ পেল না।

বাড়িতে ঢুকে তার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

তাদের সালাম দিলাম। ভাবলাম, তার মা-বাবার ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তাদের সংস্কৃতি কতো উন্নত, মন-মানসিকতা মহৎ। তার ঘরে আমাকে নিয়ে রিলাক্সড হতে বললো। হাত মুখ পরিষ্কার করে রিলাক্সড হলাম।

সে কাপড় পরিবর্তন করে পাতলা একটা সেমিজ পরে কাছেই বসে পড়লো।

আয়া পিঠা নিয়ে এলো। নারিকেলের তৈরি।

খাচ্ছি এবং গল্প করছি। এমন মুহূর্তে স্মৃতি আমাকে বললো – বন্ধু, কিছু মনে করো না। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। তুমি এখানে থাকো এবং আমাকে বিয়ে করো। আমি সব ঠিক করে নেবো।

এই কথা শোনার পর অবাক দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না। তখন বললাম, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। কিন্তু...

এরপর স্মৃতি বললো, তুমি কাল তোমার ব্যাগেজ নিয়ে চলে এসো, নো বাট, নো হেসিটেশন, ওকে।

আমাকে পেনাং বন্দরের জেটিতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আমি রাতে কোয়ার্টার ডেকে বসে ভাবছি কি করবো। একদিকে স্মৃতির ভালোবাসা, অন্যদিকে দেশের ভালোবাসা। কোন ভালোবাসা বড়। দেশ, না স্মৃতি? মনকে কোনোভাবেই বোঝাতে পারলাম না। স্মৃতির ভালোবাসা হার মেনে গেল। আমার প্রিয় বাংলাদেশের ভালোবাসা তার ভালোবাসার চেয়ে অনেক মূল্যবান।

পরের দিন অপরাহ্ণে জাহাজ পেনাং বন্দর ছাড়বে।

সকালে স্মৃতি গাড়ি নিয়ে জেটিতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ইঞ্জিন রুমে জেনারেটরের ওয়াচকিপিং ডিউটি করছি।

আমার কলিগ এসে বললো, তোর বান্ধবী জেটিতে অপেক্ষা করছে। তুই গিয়ে কথা বল।

এক ঘণ্টার পর গিয়ে কোয়ার্টার ডেকে দাড়িয়ে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালাম।

স্মৃতি আমাকে জোরে চিৎকার করে বলছে, Come on, come on - কাম অন, কাম অন।

নির্বাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি। জাহাজ কাস্ট অফ করলো। জেটি থেকে জাহাজ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

স্মৃতি তখন জোরে মুখ ঢেকে কাদছে এবং হাটু গেড়ে বসে পড়লো।

নির্লিপ্তভাবে তার চোখে পানি দেখছি। আস্তে আস্তে জাহাজ অনেক দূরে চলে এলো। সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। আমি আর চোখের পানি ঠেকাতে পারলাম না।

এসে ডিউটিতে যোগদান করলাম। ভাবলাম, স্মৃতির ভালোবাসা শুধুই স্মৃতি হয়ে আমার মানসপটে চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। ক্ষমা করো স্মৃতি। এ নৌপথে তোমার স্মৃতি নিয়েই আমার প্রিয় বাংলাদেশে যাচ্ছি।

চাটমোহর, পাবনা থেকে

তখন

– বীরাঙ্গনা

আমার জন্ম শহরে। বড় হয়েছি শহরে। পূর্ব পুরুষদের ভিটেমাটি এমন এক জায়গায় যেখানে নৌপথে চলাচলের প্রয়োজন পড়ে না।

১৯৭১ সাল। আমি তখন খুবই ছোট। মা–বাবার বিয়ের বিশ বছর পর আমরা চারটি ভাইবোন হই পিঠাপিঠি, বছর বছর। ছোট ভাইটি তখনো মায়ের পেটে। যুদ্ধ আসন্ন নিশ্চিত হয়ে আব্বা আমাদের গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন হাজিগঞ্জ থানা থেকে।

যুদ্ধের ঢামাঢোলে ছোট ভাই জন্ম নিল। মিলিটারিরা যখন শহর ছেড়ে গ্রামেগঞ্জেও ঢুকে পড়লো তখন মানুষ প্রাণ বাচানোর জন্য দৌড়াতো।

আমাদের বাড়ির মাইল খানেক দূরে পাকবাহিনী ঘাটি গেড়ে আশপাশে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরে তছনছ করছিল। যে কোনো মুহূর্তে এদিকেও হামলা হতে পারে। সবাই মিলে বেশ কতোগুলো ডিঙি নৌকা ঠিক করে বাড়ির পেছনের দিকের খালে রেখে দিল। সময় মতো সবাই যেন, বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

একটা ঠুসঠাস শব্দ কানে আসতো তো মা আমাদের চার ভাইবোনকে নিয়ে দৌড়ে কোনো রকমে নৌকায় উঠে বসে আমাদের আচল তলে ঢেকে রাখতেন। কেউ একজন মাঝি হয়ে বেয়ে নিতেন। এভাবে অসংখ্যবার আমরা নৌকায় উঠেছিলাম। আমাদের ভয় দেখিয়ে মুখ চাপিয়ে রাখতেন। ছোট ভাই *উ আ* করে কেদে

উঠতো আর মা দুধ খাওয়াতেন। কখনো সারা দুপুর, কখনো বিকেল, কখনো সারা দিন আমরা নৌকায় করে বিলে, ঝিলে ঘুরে বেড়াতাম।

একবার সারা রাত থেকেছি। কিছু খাবার থাকতো, খাবার না থাকলে আমরা তিনজন *খাবো খাবো* বলে কাদতাম। কেদে কেদে ঘুমিয়ে যেতাম।

তবে এ ঘটনাটা অনেকবার মায়ের মুখে ব্যথার রাগিণীর মতো শুনে নিজের ঝাপসা স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। আব্বাও যুদ্ধে গিয়েছিলেন হাজিগঞ্জ থানা থেকে।

রোম, ইটালি থেকে

সাংগু ও নাফ নদীর দেশে

– মোহাম্মদ রুহুল আমিন

নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশে নৌ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই এমন বাঙালির সংখ্যা বেশি নয়। যাদের জন্ম গ্রামে তারা কখনো নৌ ভ্রমণ করেনি এটা বোধ করি হতেই পারে না। ছেলেবেলা থেকে আজ এ আধো বুড়ো বয়স পর্যন্ত অজস্রবার নৌ ভ্রমনের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। এর কোনো কোনোটার কথা ভাবতে বসলে এখনো কেমন যেন উদাস হয়ে যাই।

খুব বেশি পুরনো দিনের কথা নয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ শখ চেপে বসলো বান্দরবান বেড়াতে যাবো। বান্দরবানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা এর আগে বহুবার শুনেছি। তাছাড়া পর্যটন কর্পরেশন এবং অন্যান্য টুর গাইডের পুস্তিকায় এ শহরটির অনেক সুন্দর ছবি দেখে বুঝে ফেলেছিলাম যে, একবার বান্দরবান বেড়াতে যেতেই হবে।

অবশেষে এক রাতে আমার স্ত্রী শিরিন এবং স্কুল পড়ুয়া ছেলে পুলককে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রাতের ট্রেনে চেপে বসলাম। রাতের অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে সকালে আমরা চাটগায়ে যখন পৌছালাম তখনো শহরের দোকানপাট খুব একটা খোলেনি। একটা অটোরিকশায় চেপে আমরা এক সময়ে পৌছে গেলাম বান্দরবান যাওয়ার বাসস্ট্যান্ডে। সারা রাত ট্রেনে তেমন একটা কিছু আমরা কেউ–ই খেতে পারিনি। তাই বাসস্ট্যান্ডের এক রেস্টুরেন্টে সামান্য কিছু পেটে দিয়ে বান্দরবানের বাসে ওঠে বসলাম।

বান্দরবান যাওয়ার প্রায় পুরো পথটা আমার তেমন কিছু ভালো লাগেনি। সবই আমার অতি চেনা গাও–গ্রামের ছবি। মাঝে মধ্যে দুই চারটা প্রায় পানি শুকিয়ে যাওয়া নদী। এতে আদুল গায়ে কিশোর–কিশোরীদের জাল ছেকে ছোট মাছ ধরার দৃশ্য। এমনি করে আমরা যখন বান্দরবানের খুব কাছাকাছি পৌছে গেলাম তখন সত্যি আমার অবাক হবার পালা! চেয়ে দেখি দুই পাশের ছোট–বড় অনেক পাহাড় এড়িয়ে একেবেকে আমাদের বাসটি এগিয়ে চলেছে। সামনেও সুউচ্চ পাহাড়ের পর পাহাড়। নিচে কখনো কখনো গভীর খাদে কলকল ধ্বনিতে প্রবহমান ছোট্ট শীর্ণ পাহাড়ি খরস্রোতা নদী। খুব ভালো লাগছিল আমার। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এ রূপ কতো যে হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা না দেখে অনুমান করা কখনোই সম্ভব নয়।

আমরা বান্দরবান শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌছে গেলাম দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ। বাস থেকে নেমে একটা বেবিট্যাকসিতে চেপে বসলাম আমরা। শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে *মিলনছড়িতে হিল সাইড রিসোর্ট* আমাদের গন্তব্যস্থল। ছোট্ট ছিমছাম সুন্দর শহর বান্দরবান। শহর খানিকটা পেরিয়েই আমরা আবার উচু উচু পাহাড়ের আঙিনা ঘেষে চলেছি। বলে বা লিখে বোঝাতো পারবো না যে, এ সৌন্দর্য আসলে কতোটা ব্যাপক। ভালো লাগার অনুভূতিতে আমার সমস্ত হৃদয় তখন কানায় কানায় পূর্ণ।

ঢাকা ছেড়ে যাবার আগেই আমরা হিল সাইড রিসোর্ট–এ একটা কটেজ বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম। তাই ওখানে পৌছে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের। খুব উচু এক পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় হিল সাইড রিসোর্ট। তারই মাঝে নাম জানা, না জানা অসংখ্য বৃক্ষরাজির আড়ালে–আবডালে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য কটেজ ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে। সবগুলোই দেশি–বিদেশি পর্যটকে পরিপূর্ণ। আমাদের কটেজটা উচু পাহাড়ের সিড়ি বেয়ে একটু নিচে সম্পূর্ণ বনজ বাশ, বেত, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। সব কয়টা কটেজের প্রায় মধ্যখানে দাড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর একটি কাচ ঘেরা রেস্তোরা। তার প্রায় অর্ধেকটা ছাদের মতো করে রেলিং ঘেরা খোলা আকাশের নিচে। ওখানটায় দাড়িয়ে দূরের পাহাড়ে তাকালে যে কারো ভালো লাগতে বাধ্য। পাহাড়ের ভাজে শাদা মেঘেদের নিশ্চুপ শুয়ে থাকা অথবা ঘন কুয়াশার আড়ালে বিরাট পাহাড়গুলো হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য মন ভরে দেখার মতো যতোক্ষণ ইচ্ছে।

রেস্তোরায় দুপুরের খাবার শেষে খানিকটা বিশ্রাম নেয়ার পালা। ঢাকা থেকে আগেই সাংগু নদীর সৌন্দর্যের কথা শুনে এসেছি। তাই মনটা ছটফট করছিল কখন বের হবো। খুব একটা দেরি সইলো না আর। গিন্নিকে তৈরি হতে বলতেই চেয়ে দেখি তার মনটা একটু খারাপ।

কারণ জানতে চাইলে সে জানালো, পুলকের শরীরটা কেমন যেন খারাপ হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে একটু একটু জ্বরও অনুভূত হচ্ছে।

গায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যি সত্যিই পুলকের শরীরটা খুব একটা ভালো নেই। কিন্তু হাতেও আমাদের পর্যাপ্ত সময় নেই। অগত্যা রেস্তোরার ম্যানেজারের আশ্বাসে পুলককে কটেজে রেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

রেস্তোরার রেলিং ঘেরা ছাদ থেকে অনেক নিচে রূপালী ফিতের মতো দেখা যাচ্ছে সাংগু নদী। যাবার পথ আমাদের জানা নেই। তাই বাসিত নামে চব্বিশ পচিশ বছরের এক টগবগে যুবককে গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন রেস্তোরার ম্যানেজার।

আমরা বাসিতকে অনুসরণ করলাম। আমাদের সঙ্গী হয়ে গেলেন ষাটোর্ধ এক রিটায়ার্ড ভদ্রলোক। আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে বাসিত।

কিছু দূর সামনে যেতে না যেতেই আমাদের সফরসঙ্গী ভদ্রলোক রনে ভঙ্গ দিয়ে কটেজে ফিরে গেলেন।

বাসিত আবার তার যাত্রা শুরু করলো। কখনো উচু থেকে আরো উচুতে, আবার কখনো অনেক নিচে নেমে আসতে হলো। পুরো পথটাই নানান ঝোপ–জঙ্গলে ভরা! দুই হাত দিয়ে ওসব এড়িয়ে আমরা কোনো রকমে এগিয়ে চলেছি।

ইতিমধ্যে অনেকটা সময় পার করে এসেছি, অথচ নদীর দেখা নেই। সূর্যও ততোক্ষণে কিছুটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে আমরা ঠায় দাড়িয়ে পড়লাম।

বাসিত জানালো যে, সামনের সোজা নিচু খাড়া পথ বেয়ে আমাদেরকে আরো খানিকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

ভাবলাম বেড়াতে এসে কি ঝামেলায়ই না পড়তে হলো! ইতিমধ্যে আমরা ডিসেম্বরের এই শেষ বিকেলে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আমার স্ত্রী কিন্তু তখনো খুব একটা বিরক্তি বোধ করছে না দেখে অবাক হলাম। বাসিতকে জিজ্ঞাসা করলাম এখনো তো নদীর কাছেই যেতে পারলাম না, ফিরবো কি করে?

বাতিস সাহস দিয়ে বললো, না তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। দেরি হয়ে গেলে নদীপথে বান্দরবান শহরে পৌছে যাবো।

পুরো শরীর ঘেমে একাকার। গায়ের কোট খুলে বহু আগেই কাধে, কখনো বা হাতে ঝুলিয়ে চলেছি। কিন্তু সামনের খাড়া নিচু পথটা নামবো কি করে? আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখলাম, এবার সেও যেন কিছুটা ঘাবড়ে

গেছে। তবে কিছু করারও নেই। আর ওখান থেকে ফিরে আসতে চাইলে আমরা যে নির্ঘাত ঘন অরণ্যে সমূহ বিপদে পড়বো তা বলাই বাহুল্য। অগত্যা আমার স্ত্রীকে জুতোগুলো আমার হাতে দিতে বললাম।

বাসিত বেশ সাহসী। আমার স্ত্রীকে হাত ধরে অতি সন্তর্পণে সে এক সময় এ পুলসেরাত পার করে নিল। মনে হলো এ যেন এভারেস্ট বিজয়! একটু এগিয়ে দেখলাম, অনেকটা নিচে আমরা নেমে এসেছি। আরো একটু এগোতেই চোখের সামনে স্বপ্নের সাংগু নদী এক অপরূপ রূপ মহিমায় বহমান। এতোক্ষণের যতো কষ্ট দুঃখ তা যেন এক নিমিষেই শেষ হয়ে গেল। নদীর পাড় ঘেষে দুই চারটা মারমা বাড়ি পেরিয়ে যখন আমরা নদীর তীরে যাচ্ছিলাম তখন মারমা পরিবারের সদস্যরা সব বড় বড় চোখ করে অবাক হয়ে আমাদেরকে দেখছিল।

চোখের সামনে সাংগু নদী। ডান বা বায়ে যতোদূর চোখ যায় শুধু সাংগু নদী আর তার দুই পাশে দাড়িয়ে থাকা বড় সব পাহাড়ের সারি। মাঝে শুধু হাটু জল নিয়ে নিরবধি বয়ে চলেছে সাংগু নদী। কে বলে আমাদের এ দেশ সুন্দর নয়! আমার চোখের সামনে এ মুহূর্তে যা দেখছি তা কি কখনো ভুলে যাবার মতো! তিরতির করে বয়ে যাওয়া সাংগু নদীর দুই পাশে পাথরের দেয়ালে ভর করে দাড়িয়ে আছে কতো বড় পাহাড় এবং বিচিত্র বৃক্ষরাজি। শেষ বিকেলের সূর্যটা আড়াল করে পাহাড়গুলো এক রহস্যময় জগৎ তৈরি করে যাচ্ছে নীরবে নিঃশব্দে। সূর্যের বিপরীতে নদীর এ ধারে দাড়িয়ে থাকা পাহাড়ের চূড়ায় সোনালি রোদের লুকোচুরি খেলা।

নদীতে কোনো নৌযান না দেখে বাসিতকে বললাম, এখন উপায়?

বাসিত সাহস দিয়ে বললো যে, কোনো ভয় নেই। নিশ্চয়ই নৌকা এসে যাবে।

এ যেন জাদু! সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম নদীর বাক ঘুরে আসছে একটা ডিঙি নৌকা। কাছে আসতেই বাসিত কথা শুরু করলো মাঝি সুনীলের সঙ্গে। সাব্যস্ত হলো আমরা নৌকায় বান্দরবান পর্যন্ত যাবো।

সামান্য ছই ঘেরা লম্বা একটা নৌকা। দুই-তৃতীয়াংশই খোলা। নৌকায় আমরা পা রাখতেই সুনীল ছেড়ে দিল নৌকাটা। এতে খানিকটা ঝাকুনি খেয়ে পড়ে গেল আমার স্ত্রী শিরিন আমারই ওপর। না, তেমন কোনো অঘটন ঘটেনি। বরং হেসে উড়িয়ে দিল যেন ব্যাপারটা কিছুই না। আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে শিরিন আমার পাশে বসলো।

নৌকা চলছে তিরতির করে বয়ে যাওয়া স্রোতের অনুকূলে। কখনো বা আটকে যাচ্ছিল পানির নিচে লুকিয়ে থাকা বালির ঢিবিতে। দুই পাশে উচু পাহাড় সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তার মাঝে এই বয়ে যাওয়া সাংগু নদীতে আমাদের নৌকা ভ্রমণ কার সঙ্গে তুলনা করবো! সাঝের অন্ধকার এই বুঝি বা নামবে। নদীর দুই পাড়ে আদিবাসীরা কেউ বা হাটু জলে গোসল করছে। ছোটরা আর অন্য সব বাঙালি দুরন্ত ছেলেদের মতোই সাংগু নদীর জল তোলপাড় করে দিয়ে স্নানে মেতেছে।

আমরা যেন আস্তে আস্তে আলো আর আধারির লুকোচুরি খেলার এ পাহাড়ি প্রকৃতিতে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবে কতোক্ষণ আমাদের নৌকা চলেছে মনে নেই। প্রকৃতির এই রূপ, রস যখন এক সময় অন্ধকারে তলিয়ে গেল তখন অন্য এক জগতে আমরা প্রবেশ করলাম। চারদিক ইতিমধ্যেই অন্ধকারে প্রায় পুরোটা ডুবে গেছে। কেমন যেন সব নীরব নিঃশব্দ। শুধু আমাদের চারটি প্রাণীর মধ্যে সামান্য কিছু কথাবার্তা। দুই নয়ন ভরে প্রকৃতির মেলে দেয়া এ অবারিত সৌন্দর্য উপভোগ করা। আবছা অন্ধকারে ছায়ার মতো দাড়িয়ে আছে পাহাড়গুলো। কেমন যেন একটু ভয় ভয় করতে শুরু করেছে তখন।

সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা এক পাহাড়ের দেশে এই সাংগু নদীতে আরো বেশি অচেনা দুজন মানুষের মধ্যে আমরা। বাসিত আর সুনীল আমাদের কে? যদি কিছু একটা করেই বসে তাহলে প্রতিরোধ করবো কিভাবে? নদীর পাড় ঘেষে পাহাড়ের আঙিনায় বসবাসকারী আদিবাসীরা কোনো খোজ পাবে আমাদের? এসব ভাবতে

ভাবতে শিরিনের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু সন্ধ্যাবেলার এই আধারে তাকে একটুও বিচলিত মনে হলো না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সে একেবারে প্রায় নৌকায় গলুইয়ের কাছে এসে বসলো এবং কিছুটা ঝুকে হাত বাড়িয়ে সাংগুর পানিতে কিশোরীর মতো জল ছিটিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো।

কতো কিলোমিটার আমরা পাড়ি দিয়েছি জানি না। অবশেষে যখন আমরা বান্দরবান শহরের ঘাটে পৌছি তখন রাত প্রায় আটটা। নৌকা ছেড়ে শহরে পা দিয়েই বুঝলাম আমরা এখন অনেক মানুষের ভিড়ে।

আরেকবারের ছোট্ট অথব মনে রাখার মতো একটা ঘটনা। ২০০৩ সালে একটানা চার দিনের ঈদের ছুটি পাওয়া গেল। তাই একটু অন্যভাবে ঈদের ছুটি কাটাবো বলে আমরা পাচ বন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ঠিক হলো আমরা সপরিবারে কক্সবাজার আর সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ বেড়িয়ে আসবো।

সিদ্ধান্ত হতে না হতেই আমাদের সবগুলো পরিবারের সবাইর মধ্যে কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব শুরু হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা সব নানান আয়োজনে ব্যস্ত। কেউ কেউ ক্যামেরাটা শেষবারের মতো পরখ করে নিল। কেউ বা আবার ওখানে গিয়ে কি করবে তার ফর্দ তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। গিন্নিরা একে অন্যের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণ টেলিফোনে ব্যস্ত থাকলো। মোট কথা, আমাদের বেড়াতে যাবার ঘোষণা সবার মধ্যেই কেমন যেন একটা আনন্দের বন্যা বইয়ে দিল।

অবশেষে ঈদের আগের দিন দুটো মাইক্রোবাসে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পথে খুব ভালো কাটেনি আমাদের। প্রচণ্ড যানজটের কারণে ঢাকা থেকে সকালে রওনা দিয়ে আমরা শেষ বিকেলে চাটগাও পৌছাই। চাটগা পেরিয়েও আমরা যানজট থেকে অব্যাহতি পেলাম না। শেষ পর্যন্ত যখন আমরা কক্সবাজারে পৌছি তখন রাত সাড়ে দশটা।

ঢাকা থেকেই আমরা কক্সবাজারে কয়েকটি রুম বিশিষ্ট বেশ বড়সড়ো একটা রেস্ট হাউস বুক করে রেখেছিলাম। ওখানে পৌছাতে না পৌছাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা সব নেমে হই চই শুরু করে দিল। এতোক্ষণের এই দীর্ঘ পথে তাদের যে কতো কষ্ট হয়েছিল তা যেন তারা এক নিমিষেই ভুলে গেল।

রান্না-বান্না করার আয়োজন আগে থেকেই করা ছিল। ফলে রাতে খাবার-দাবারের তেমন কারো কোনো অসুবিধা হয়নি। খাবার শেষে গল্প। এবং আড্ডা শেষে যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম তখন গভীর রাত।

পরদিন আমরা ছেলেরা সব কাছেই একটা মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েছি। রেস্ট হাউসে ঈদের আমেজ ছিল পুরো ষোল আনা। ওখানকার বাবুর্চি ওই দিনের রান্নার আয়োজন ঈদের মতো করেই করেছে। মেয়েরা তাদের নতুন নতুন সব পোশাক বের করে তার মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছে। মোট কথা, নিজেদের বাসা-বাড়ি ছেড়ে বহু দূরে থাকলেও ঈদের আমেজ প্রায় পুরোটাই ছিল আমাদের মাঝে।

ঈদের নামাজ ও খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা এবার বেরিয়ে পড়েছি সাগর সৈকতে। দুটো জিপ ভাড়া করে সি-বিচ দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো হিমছড়িতে। একধারে অনুচ্চ পাহাড় আর একাধারে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের ভেতর দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি হিমছড়ি। সমুদ্র এবং পাহাড়ের এতো কাছাকাছি অবস্থানে আমরা সবাই অভিভূত। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ এসে আমাদের গাড়ির চাকায় আছড়ে পড়ছিল। কোথাও কোথাও আবার ঝরনা ধারা বইছে উচ্ছল বাধন হারা দুরন্ত কিশোরীর মতো।

পরদিনের কথা। খুব ভোরে যাত্রা শুরু করে আমরা মোটামুটি সকালবেলাতেই টেকনাফে হাজির হলাম। ঘাটে গিয়ে সেন্ট মার্টিনস-এর উদ্দেশ্যে সুড় সুড় করে সবই বোটে উঠে পড়লো। বেলা সাড়ে দশটায় আমাদের বোট চলতে শুরু করেছে। কিছুটা যেতে না যেতেই আমাদের বোট গিয়ে পড়লো নাফ নদীতে। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম, এ পাড়ে নদীর ধার ঘেষে ওই যে দূরে দাড়িয়ে থাকা পাহাড় আর নদীর ওপাড়ে ধূসর পাহাড় ঘেরা স্বপ্নের দেশ মিয়ানমার। মাঝে অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য নিয়ে নিরবধি বয়ে চলেছে নাফ নদী।

ওপারে মিয়ানমারের বাড়িঘর থেকে শুরু করে বৌদ্ধ মন্দিরগুলো এক মায়াময় স্বপ্নালোকে হাতছানি দিয়ে যেন আমাদের ডাকছে। সমগ্র নদীর বুক জুড়ে বাতাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে গাঙচিলদের কি অবাধ বিচরণ!

আরেকটু এগিয়ে আমরা সমুদ্রে পড়বো। আমি ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। শুনেছি সমুদ্রের বড় বড় সব ঢেউয়ে বোটগুলো কেমন জানি দুলতে থাকে এবং অনেকে ভয়ে কেঁদেও ফেলে। তাই খুব ভয়ে ভয়ে আছি। তার ওপর সঙ্গে আছে সাতার জানা না জানার এক পাল ছেলেমেয়ে এবং ললনার দল। তাই ভয়টা আমার কিছুতেই কাটছিল না। তবে পাছে কেউ *ভীতুর ডিম* বলে ডাকে এ জন্য আমার মনের ভাবটা মনেই রয়ে গেল।

সামনেই সমুদ্রের সীমানা শুরু। বিস্তৃত বিশাল জলরাশি, কোনো কূলকিনারা নেই। সমুদ্রের তীর কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কে জানে! তবে সমুদ্রের যে ভয়াল চিত্র আমার মনে একটু আগেও ঠাই করে নিয়েছিল তা মুহূর্তেই যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। পুরো সমুদ্র কেমন যেন নীরব হয়ে দাড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে। ওই যে অনেক দূরে যেখানে সমুদ্র এবং আকাশ মিলে একাকার হয়ে গেছে তা কতো দূরে! আমি অবাক হয়ে ভাবি।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর আমরা স্বপ্নের দ্বীপ সেন্ট মার্টিনস-এ নামলাম। খুব বেশি সময় আমাদের হাতে ছিল না। তাই পুরো দ্বীপটা খুব কম সময়েই চষে বেড়ালাম আমরা। সমুদ্রের কোল ঘেষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজস্র বড় পাথরে সমুদ্রের বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। তারই দুই একটার ওপর দাড়িয়ে, বসে আমাদের ছবি তোলার উৎসব চলছিল।

বেলা গড়াতেই একটা হোটেলে রূপচাদার ফ্রাই দিয়ে দুপুরের খাবারটা কোনো রকমে সেরে আমরা আবার বোটে এসে উঠলাম। এ সময়ে বোটে মোটামুটি আমাদের গ্রুপের যাত্রী ছাড়া অন্য তেমন কেউ একটা ছিল না। বোট আবার চলতে শুরু করেছে। ছেলেমেয়েরা সব দল বেধে গল্প, গান এবং হই হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে।

সমুদ্রটা ছিল খুবই শান্ত। ততোক্ষণে সূর্যটাও কেমন যেন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। একটু হিম হিমও লাগতে শুরু করেছে। শান্ত সমুদ্রটা যেন আরো শান্ত হয়ে গেছে। এবং এক সময় সত্যি সত্যিই সূর্যটা আস্তে আস্তে রক্তিম বরণ ধারণ করে সমুদ্রের ওই ধারে অথৈ গভীর জলে ডুব দিয়েছে। আমরা সবাই সূর্য ডোবার এ অপরূপ রূপ প্রাণ ভরে দেখেছি যা আমাদের বহুকাল মনে থাকবে।

আমরা তখনো টেকনাফ থেকে বহুদূরে। সবাই গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে গল্পে বিভোর। সাঝ নেমেছে এরই মধ্যে। এতোক্ষণে নদী. সমুদ্র সবই আধারে ডুবে যাবার কথা। অথচ চারদিকে কেমন যেন আলোর বন্যা। ঈদের এক ফালি চাদ আজও উঠেছে সত্য। কিন্তু এ চাদের এতো আলো হবার কথা নয়, তাও বুঝি একটু পরেই ওই চাদটাও সমুদ্রের নীল জলে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখি আকাশের গায়ে হাজার লক্ষ তারার মেলা। সব কেমন যেন মিটমিট করে জ্বলছে। পুরো আকাশ একেবারে পরিষ্কার। কোথাও এতোটুকু মেঘেরও দেখা নেই। তাই তারাগুলো এ সমুদ্রের বুকে অকৃপণভাবে আলো বিতরণ করে চলেছে।

আকাশের কয়টা দিক জানি না! আমরা চেয়ে দেখলাম পুরো আকাশের সব দিক জুড়ে তারাগুলো সব মেলায় বসেছে। আর সে তারার আলোতে আমরা অবগাহন করে চলেছি। একটু হিম হিম, একটু তারার আলোতে আমরা যখন সিক্ত ঠিক তখনি বোটটা এসে নাফ নদীর তীরে এসে ভিড়লো। কেমন যেন কোলাহল শুনতে পেলাম। আবছা আলোয় দেখলাম দুই তিনটা ছিপ নৌকা আমাদের বোটের গা ঘেষে দাড়িয়েছে। ওই নৌকার প্রতিটিতে দুই তিনজন করে লোক। এ অবস্থা দেখে প্রথমটায় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম ডাকাত পড়লো নাকি আমাদের বোটে!

সব কিছু বুঝে ওঠার আগেই বোটের লোকেরা জানান দিল যে, বোট টেকনাফ ঘাটে আর যাবে না। কারণ যে সরু খালটা বেয়ে আমরা টেকনাফ ঘাট থেকে নাফ নদীতে পড়েছিলাম তা ভাটার টানে এখন এটো কাদায়

মাখামাখি। শুধু মাঝখান দিয়ে অনধিক এক ফিট গভীরতার পানি। ওই ছিপ নৌকায় চেপেই আমাদেরকে ঘাটে পৌছাতে হবে।

আমরা এর জন্য মোটেও তৈরি ছিলাম না। তবে এটাই নাকি এখনকার নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। অগত্যা আমরা সবাই এক এক করে ছিপ নৌকায় উঠে পড়ি।

মাঝিরা পানিতে নেমে নৌকা ঠেলে অবশেষে প্রায় ঘাটের কাছে পৌছে আমাদেরকে নামতে বলে।

কিন্তু নামবো কিভাবে! নৌকা থেকে পা দিতেই যে কাদায় সব ডুবে যাবে। অথচ এছাড়া আর উপায়ই বা কি! তাই আমরা সবাই জুতো খুলে নেমে পড়লাম।

কুড়িল, ঢাকা থেকে

রুমমেট ও আংটি

– মাহফুজা আলম

৪ সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিন। যখন এইচএসসি–তে পড়তাম তখন আমি ও আমার দুই বান্ধবী সর্বদা এক সঙ্গে থাকতাম। আমার এই দুই বান্ধবীর মধ্যে একজন অনেক দূরে সরে গেছে তার লাভারের কারণে। অন্যজন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। ফলে বান্ধবীদের প্রতি আমার কেমন যেন বিতৃষ্ণা জন্মেছে। চিন্তা করলাম আর বান্ধবী নয়, এবার একাই থাকবো।

এখন হস্টেলে থাকি। আমাদের হস্টেল থেকে মেঘনা নদী সামান্য দূরে। আমাদের হস্টেলটি দুই তলা বিশিষ্ট। হস্টেলের ছাদ থেকে মেঘনা নদী দেখা যেতো। নদী পারের গ্রাম, দাড়িয়ে থাকা কাশবনের সারি, মাটিতে বিছানো সবুজ ঘাস, মাঝে মধ্যে পাথর কিংবা বালি বোঝাই লঞ্চের যাওয়া আসা দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করতো নৌকা নিয়ে জলের ওপর ভাসতে। কিন্তু আমি তো সাতার জানি না। আমাদের ক্লাসের সকলে নৌপথে সুন্দরবন দেখতে গেল। আমার মাথাতে একটিই ভয়, যদি পড়ে যাই।

আমার জন্মদিনে রুমমেটরা ধরলো খাওয়াতে হবে।

রাজি হলাম।

তারা আরো একটি শর্ত দিল, আমরা যেখানে যাবো, আপনাকেও সেখানে যেতে হবে।

সরল বিশ্বাসে তাদের শর্তে রাজি হলাম। কিন্তু আমি কি জানতাম তারা এভাবে আমাকে বিপদে ফেলবে!

যাহোক, প্রথমে নৌকাতে উঠতে ভয় লাগছিল। কিন্তু রুমমেটরা নাছোড়বান্দা, আমাকে নৌকাতে ওঠাবেই এবং আমাকে আশ্বাস দিচ্ছে, আমরা বেশি দূর যাবো না। আশপাশেই নৌকা নিয়ে ঘুরবো।

আমরা নৌকা নিয়ে প্রথমে গেলাম পাথরঘাটা যেখানে রয়েছে পাথরের উচু–উচু পাহাড়। এই পাথর দিয়েই তৈরি হবে সিমেন্ট। তারপর গেলাম জুট মিলস–এর জেটিতে ও চিংড়ি মাছের হ্যাচারিতে।

নৌকা নিয়ে ঘুরতে ভালোই লাগছিল। হঠাৎ আমার রুমমেট বলে উঠলো, দেখো দেখো কাশবনে কি সুন্দর শাদা রঙের কাশফুল ফুটে রয়েছে।

আমরা মাঝিকে বললাম, কিছু কাশফুল ছিড়বো।

মাঝি নৌকা নিয়ে কাশবনে যেতেই আমরা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলাম কে কতো কাশফুল ছিড়তে পারে।

ফুল ছেড়া শেষে আমরা যখন ফিরে আসবো তখন খেয়াল করলাম নৌকাতে সাপ উঠেছে। আমরা সকলে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদের জানে পানি ছিল না। মাঝি তার বৈঠা দিয়ে সাপটিকে পানির মধ্যে ফেলে দিল।

নৌকা থেকে সাপটিকে ফেলে দেয়ার পরেও আমরা আর ইজি হতে পারছিলাম না। নৌকার এক পাশে গিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। হঠাৎ দমকা হাওয়া বইতে শুরু করলো। নদীতে স্রোত বইতে লাগলো। নীল আকাশ কালোমূর্তি ধারণ করলো। স্রোত আমাদের নৌকাকে প্রায় পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড ঢেউ আমাদের নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খেতে লাগলো। আমাদের নৌকা নাচতে লাগলো। এক সময় নৌকার এক পাশ ফেটে গিয়ে নৌকা পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নৌকা পানির নিচে তলিয়ে যেতে লাগলো। চিৎকার, চেচামেচি ও পানির গর্জন ছাড়া অন্য কিছুই মনে নেই আমার।

আমাকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালে। পরে শুনলাম ছেলেরা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। যখন কিছুটা সুস্থ হয়ে হস্টেলে ফিরে আসি তখন জানতে পারলাম আমার একজন রুমমেটকে হারিয়ে ফেলেছি। তাকে কোথাও খুজে পাওয়া যায়নি।

চলে আসি নিজের রুমে। রুমে ঢুকতেই দেখতে পেলাম তার বেড, টেবিল কি সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু হায়! সুন্দর করে সাজানোর সেই মানুষটিই নেই। দুপুরে ডাইনিংয়ে খেতে বসে খেয়াল করলাম আমার সেই (মৃত) বান্ধবীর দেয়া আংটিটিও হারিয়ে ফেলেছি যা সব সময় আমার হাতে থাকতো। এই আংটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কতো স্মৃতি। বান্ধবীর দেয়া শেষ চিহ্ন, সবই হারিয়ে ফেলেছি।

আমি আর জন্মদিন পালন করি না। জন্মদিন এলেই আমার রুমমেট ও সেই আংটির কথা মনে পরে।

রাজঘাট, যশোর থেকে

ইউনিভার্সিটি ছাত্রের কদর

– অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন

এক সময় আমাদের সমাজে ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের খুব কদর ছিল। ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী বললে সমাজের কাছে খুব আদর পাওয়া যেতো।

১৯৬১ সাল। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যেতে হয় সদরঘাট থেকে লঞ্চ কিংবা নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্টিমারে। বর্ষাকালে সাধারণত সবাই স্টিমারে যেতে চাইতেন।

সে বছর স্টিমারে করে গোয়ালন্দ যাচ্ছি একা। ঢাকার ফুলবাড়িয়া থেকে রাত আটটার ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ গেলাম।

পৌছালাম রাত সাড়ে নয়টায়। স্টিমার ছাড়বে রাত সাড়ে দশটায়। হাতে পয়সা কম। তাই স্টিমারের ডেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

স্টিমার ঘাটে দাড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম যে সবাই যার যার মতো বিছানা পেতে আগেই জায়গা দখল করে আছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ আমার সঙ্গে কোনো বেডিং নেই। চিন্তাযুক্ত মনে টিকেটের লাইনে এসে দাড়ালাম। টিকেটের লাইনটি অনেক লম্বা এবং আমার সামনে প্রায় পঞ্চাশজন দাড়িয়ে আছেন।

লাইনে আমার সামনে মধ্য বয়সের এক ভদ্রলোক দাড়িয়ে আছেন। কাউন্টার তখনো খোলেনি। আমার সঙ্গে তিনি আলাপ জুড়ে দিলেন। এবং আমার পরিচয় শুনে বললেন যে, আমার বেডিংটি স্টিমারের ডেকে পেতে এসেছি। ওখানে কেউ নেই। তুমি আমার বেডিংয়ে গিয়ে বসো। তোমার টিকেট কেটে নিয়ে আসছি। এই বলে ভদ্রলোক তার বেডিংটি কোন জায়গায় রেখে এসেছেন, বিছানার চাদরের কি রঙ তা বলে দিলেন।

স্টিমারের ডেকে এসে খুজে খুজে বেডিংটি পেয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর সটান শুয়ে পড়ি এবং ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে। বিভিন্ন কোলাহলেই আমার ঘুম ভাঙে।

টানা সাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। চেয়ে দেখি ভদ্রলোক আমার কাছে বসে আছেন এবং আমার ব্যাগটি তার পাশে।

আমি ক্ষমা চাইতেই বললেন, না না ঠিক আছে। তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, আমাদের দায়িত্ব তোমাদের সেবা করা। যদিও রাতে ঘুমাতে পারিনি, তবুও তুমি তো কষ্ট পেলে না এটাই আমার তৃপ্তি।

আজ আমার বয়স ষাটের উপর। এ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছি প্রথম থেকে অর্থাৎ গত চৌত্রিশ বছর ধরে। মাঝে মধ্যে ভাবি বর্তমান প্রজন্মে যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, সমাজে তাদের এই কদর আছে কি না।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

ধন্য

– জান্নাত হক

আষাঢ়ের এক শান্ত দুপুর। আকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেঘেরা। ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরছে অবিরত। গন্তব্য চাদপুর। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গুমোট গরম। তাছাড়া ক্যাবিনে বেশিক্ষণ বসলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই চিরকালের অভ্যাস মতো বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ক্যাবিনের সামনে হাটাচলার জন্য বেশ চওড়া করিডোর। করিডোরে কিছু দূর পর পর মেঝের সঙ্গে স্থায়ীভাবে আটকানো চেয়ার। বাইরে দাড়িয়েই দৃষ্টি মেলে দিলাম বাইরের দিকে। মেঘনা এখানে বেশ চওড়া। অনেক অনেক দূরে আবছাভাবে সবুজ সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। উপভোগ করছিলাম বৃষ্টিস্নাত শান্ত মেঘনার সৌন্দর্য। কিছুক্ষণ পর ডানে তাকাতেই দেখলাম কে যেন সামনের চেয়ারে বসে আছে। একটু পরিচিত মনে হলো। ভালো করে খেয়াল করতেই অবাক হয়ে গেলাম।

আরে, আপেলভাই না?

ছাইরঙা সেই বহু বছরের পুরনো শার্টটা গায়ে।

আপেলভাই আমার এক পাড়াতো ভাই। ছোটবেলা থেকেই ওনার সঙ্গে আমার খুব খাতির। আপেলভাই একটু পাশ ফিরতেই নিশ্চিত হলাম। নিঃসঙ্গ দুপুরে একটু আশার আলো দেখতে পেলাম যেন। দৌড়ে ছুটে গিয়ে আপেলভাই বলে এক চিৎকার দিয়ে তার দুই কান ধরে জোরে একটা ঝাকুনি দিয়ে মুখটা আমার দিকে ফেরাতেই তো আমি থ। লক্ষ বাতি যেন জ্বলে উঠেই দপ করে নিভে গেল। ছিঃ ছিঃ, এ কার কান ধরে টানলাম আমি? এতো আপেলভাই না। অন্য ছেলে। বিস্ময়ে হতবাক এই আমি লজ্জায় কুকড়ে গেলাম।

অপ্রস্তুত ছেলেটি একটু ধাতস্থ হয়ে মিষ্টি হেসে বললো, আমার কান?

আর তখনই খেয়াল করলাম তার কান দুটি এখনো আমার হাতের মুঠোয়। ঝটপট কান ছেড়ে দিয়েই দৌড়ে পালালাম।

ক্যাবিনে বসে চিন্তা করছিলাম। কি ঘটনা ঘটালাম আমি? ছিঃ ছিঃ, অপরিচিত একটা ছেলের কান ধরে টানাটানি। উফ, কি লজ্জা! মাফ চেয়ে আসবো কি?

আবার করিডোরে বের হলাম। ডানে-বামে তাকালাম। কেউ নেই। শূন্য করিডোর। সামনে এগোতেই করিডোরের শেষ প্রান্তে দেখলাম লঞ্চের ছাদে ওঠার সিড়ি। উঠলাম ছাদে। চারপাশে দৃষ্টি বোলালাম। ছাউনির নিচে সজ্জিত চেয়ার। ওই তো রেলিং ধরে একটু দূরেই দাড়িয়ে আছে।

ভীরু পায়ে কাছে গিয়ে কাপা কাপা মৃদু কণ্ঠে সরি বলতেই মুখ ফিরিয়ে আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেললো সে।

না না ঠিক আছে। সরি বলার কিছু নেই।

লজ্জায় মাটি থেকে চোখ তুলতে পারছিলাম না।

আপনি এতো লজ্জা পাচ্ছেন কেন? এ রকম তো ঘটতেই পারে, তাই না? তাছাড়া আমি কিছু মনে করিনি।

তারপরও অবনত মুখে চুপচাপ দাড়িয়ে আছি। আমার অস্বস্তি একটু কাটাতেই সে বললো, আপেলভাইয়ের সঙ্গে খুব খাতির, তাই না?

মাথা ঝাকিয়ে বললাম, হ্যা।

নাম কি আপনার?

অনি।

কিসে পড়ছেন?

এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি।

আমি নাঈম। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আইনে পড়ছি। চাদপুরে কোথায় যাচ্ছেন?

নানাবাড়ি।

আরে! আমিও তো!

পাচ মিনিটেই সহজ হয়ে গেলাম। উচ্ছল গল্পে মেতে উঠলাম দুজনে। যেন কতো দিনের পরিচয়।

এই হচ্ছে পরিচয়ের সূত্র। এটা তিন বছর আগের কথা। সেদিন বাকি পথটা গল্পেই কেটেছিল। দুজন দুজনকে একদিনেই যেন চিনে নিয়েছিলাম অনেকখানি। এখনো চিনেই চলেছি। অনেক ভালো লাগা মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়েছে এর মধ্যে। মন্দের সংখ্যাও কম নয়। তবুও আমি ধন্য তাকে পেয়ে।

আজও আমরা প্রায়ই মনে করি সেই প্রথম দিনের কথা। সেই কান টানাটানির কথা। আর হেসে উঠি দুজনেই।

পূর্ব বাসাবো, ঢাকা থেকে

স্বদেশ- বিদেশ

– ডা. কায়সার মামুন

এবার কোরবানির ঈদে ঢাকা গেলাম বহুদিন পর। কোরবানির পরের নারকীয় পরিবেশের কথা ভেবে বছর দশেক দেশে গিয়ে ঈদ করা হয়নি। যাহোক, ঢাকা এসে আমার বোনের ইচ্ছায় ঠিক হলো সবাই মিলে কক্সবাজার বেড়াতে যাবো। সেখানে শেষ গিয়েছিলাম ১৯৯০ সালে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে।

ঠিক হলো *গ্রীন লাইন*–এর রাতের বাসে যাবো। কিন্তু ফিরতে হবে বিমানে। কারণ আমাদের ফেরার তারিখে বিরোধী দল সকাল–সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে।

রাতের বাসে স্বল্প সময়ে সহজেই কক্সবাজার পৌছালাম। পরের দুই দিন সৈকতে বেড়িয়ে ভালোই কাটলো। সকালে নাশতা খাবার সময় হোটেলে দেখা হলো আমার এক জুনিয়র সহপাঠীর সঙ্গে। তার উৎসাহে ঠিক হলো পরদিন সবাই সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে বেড়াতে যাবো। কক্সবাজার সৈকতের এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে প্যাকেজ ট্রিপ কেনা হলো।

পরদিন ভোরে ঠিক সময়ে একটা মাইক্রোবাস এসে আমাদের নিয়ে টেকনাফ রওনা হলো। কক্সবাজার–টেকনাফ রাস্তা বেশ খারাপ। খুব ধীরে চালিয়ে আড়াই ঘণ্টা পরে টেকনাফ ঘাটে পৌছালাম। প্রচুর লোক এখানে অপেক্ষা করছে। চারদিকে পচা মাছ ও শুটকির তীব্র গন্ধ। বসার কোনো জায়গা নেই।

এক ঘন্টা অপেক্ষার পর আমাদের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো সি–ট্রাকে উঠতে। ছোট্ট কাঠের সিড়ি। কোনো হাতল নেই। আমার কোলে তিন বছরের ছেলে। কিছুটা ইতস্তত করছিলাম। নৌ পরিবহন সংস্থার এক সহৃদয় কর্মী হাত বাড়িয়ে দিলেন। এবার সহজেই সি–ট্রাকে ওঠা গেল।

আমাদের দেশটা যদিও গরিব, আমাদের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দেহের আকার মোটেই কম নয়। নৌ পরিবহনের কর্মকর্তারা কাঠের বেঞ্চিতে সিট নাম্বার লেখার সময় ভেবেছিলেন আমাদের দেহের সাইজ হবে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশগুলোর লোকদের মতো অথবা তারা হয়তো ভেবেছিলেন এই বেঞ্চগুলোতে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা বসবে, তাদের বাবা–মা নয়।

যাহোক, খুব গাদাগাদি করে বসতে হলো। হাটু ঠেকে যাচ্ছে সামনে বসা লোকের হাটুতে। সামনে বসা লোকটি যদি কোনো সুন্দরী তরুণী হতেন তাহলে হয়তো খুবই খুশি হতাম। কিন্তু আমার যে রকম নসিব! আমার সামনে বসেছেন মধ্য বয়স্ক গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক। তাই চোখ বুজেও কোনো রোমান্টিক চিন্তা আনা গেল না।

শীতের দিনে গরমে সিদ্ধ হচ্ছি। কিন্তু সি–ট্রাক নড়ার কোনো লক্ষণ নেই। তার উপর রয়েছে অবুঝ ধূমপায়ীদের আক্রমণ। এরা চারদিকে বাচ্চাদের উপেক্ষা করে নির্বিকারভাবে সিগারেট ফুকে যাচ্ছে।

লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সি–ট্রাকের দুটো ইঞ্জিনের একটা স্টার্ট নিচ্ছে না। তাই সারেং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, একটা ইঞ্জিনের ওপর ভরসা করে তিনি কিছুতেই এতো যাত্রী নিয়ে সাগর পাড়ি দেবেন না।

প্রায় দুই ঘন্টা অপেক্ষার পর দুটো ইঞ্জিনই চালু হলো। আমরা নাফ নদীর মোহনা দিয়ে বঙ্গপোসাগরের দিকে চললাম।

কিছু দূর যেতেই দেখলাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুবিশাল রণতরী আমাদের সমুদ্র সীমানা পাহারা দিচ্ছে। গর্বে বুক ভরে উঠলো। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে পৌছালাম। দ্বীপে নামতেই টুর গাইড তাড়া দিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে।

সি–ট্রাক সাধারণত সকালে এসে চার ঘণ্টা পরে ফিরে যায়। কিন্তু আমাদের পৌছাতে দুই ঘণ্টা দেরি হওয়ায় হাতে আছে আর ঘণ্টা দেড়েক। বিশাল তাজা রূপচান্দা মাছ ও লবস্টার দিয়ে দুপুরের খাবার সারলাম। কয়েকটা রিকশা ও ভ্যান গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম প্রবাল দ্বীপের বিখ্যাত সৈকতের দিকে। সৈকতের কাছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের তৈরি করা বাড়ি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হলো খুব বেশি যত্নে নেই। জানি না হুমায়ূন আহমেদ শেষ কবে এখানে এসেছিলেন।

সৈকতের পরিষ্কার নীল পানি ছড়িয়ে থাকা প্রবালের সৌন্দর্যে অবাক হলাম। মনে হলো এতো কষ্ট করে এখানে আসা সার্থক হয়েছে। হাতে তেমন সময় ছিল না। তাই ছুটতে ছুটতে এসে সি–ট্রাকে উঠলাম। নির্বিঘ্নে টেকনাফ ঘাটে পৌছালাম।

এবার নামার ব্যবস্থা আরো ভয়ংকর। শুধু ছোট্ট সিড়িই নয়, ধারে–কাছে কোনো আলো পর্যন্ত নেই। সহযাত্রীরা সবাই তাড়া দিলেন দ্রুত কক্সবাজার ফিরতে হবে। কারণ রাস্তা রাতের বেলা কতোটুকু নিরাপদ এটা নিয়ে সন্দেহ আছে। ভাঙা রাস্তা দিয়ে বেশ জোরে গাড়ি চালিয়ে আমরা কক্সবাজার ফিরলাম।

আমাদের এক সহযাত্রী সারা দিন প্রচুর বার্মিজ বড়ইয়ের আচার খেয়েছিলেন। তাই ডায়ারিয়ার কারণে ওনাকে টেকনাফ–কক্সবাজার রাস্তার পাশের প্রায় সবগুলো মসজিদের বাথরুম ভিজিট করতে হলো।

মাস তিনেক পরের কথা। আমার গিন্নিকে বোঝাতে পারলাম যে, আমাদের আরঅ্যান্ডআর (Rest and Recreation বা R&R) দরকার। ঠিক হলো আন্দামান সাগরে ফুটে থাকা ফুকেট (Phuket) দ্বীপে যাবো। এটা থাইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় দ্বীপ। বিশাল সারাসিন সেতু মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ফুকেটের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। প্লেনের টিকেট কাটার সময় ফি ফি (Phi Phi) দ্বীপে যাবার প্যাকেজও নিলাম। আন্দামান সাগরে বেশ কিছু ছোট ছোট দ্বীপ আছে। ফি ফি দ্বীপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।

ফুকেটে পৌছানোর পরদিন সকালে গাড়ি এলো আমাদের জেটিতে নিয়ে যেতে। ওখানে পৌছাতে টুর অপারেটর ছুটে এসে জানালো আমাদের সারা দিনের প্রোগ্রাম। এরপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে জাহাজে এলো।

ফি ফি Cruiser-3 হচ্ছে চারশ আসনের Cruiseship বা বড় লঞ্চ। এটা আমাদের নিয়ে ফি ফি দ্বীপে যাবে। উপরের ডেকে শামিয়ানা টানানো। ডেকে চেয়ার পাতা। মাঝের মেইন ডেক পুরোপুরি এয়ারকন্ডিশন্ড। আরামদায়ক চেয়ার পাতা। নিচের ডেকে রয়েছে দোকান, বিউটি পার্লার ইত্যাদি।

হালকা নাশতার পর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। চা, কফি, কোকাকোলা ইত্যাদি বার বার সার্ভ করা হচ্ছে। ফুকেট ছেড়ে ঘন্টা খানেক যেতেই চোখে পড়লো ছোট ছোট লাইমস্টোন–এর পাহাড়। পানি ভেদ করে মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে আছে।

প্রায় তিন ঘন্টা চলার পর আমরা ফি ফি দ্বীপের উত্তর অংশে এসে পৌছালাম। মায়া উপসাগর (Maya Bay) ও অদ্ভুত সুন্দর সৈকত দেখলাম। বিখ্যাত অভিনেতা লিওনার্ডো ডি ক্যাপৃও এখানেই দি বিচ (The Beach) সিনেমার শুটিং করেছিলেন। Pirates Cove, Monkey Bay ইত্যাদি দেখে আমরা দক্ষিণ ফি ফি দ্বীপে পৌছালাম। এখানে মানুষ বসবাসের অনুমতি আছে।

পুরো দ্বীপে অনেক ছোট ছোট বাংলো বাড়ি। পাচতারা হোটেল গ্রুপ এগুলো বানিয়েছে। পরিবেশ নষ্ট হবে বলে ইট বা কংকৃটের কোনো বাড়ি এখানে বানানো নিষেধ। অনেক ইন্টারনেট কাফে, পাবলিক ফোন বুথ আছে। দেখে বোঝার উপায় নেই আমরা মূল ভূখণ্ড থেকে এতো দূরে আছি। অনেক রেস্টুরেন্ট, দোকান, বিউটি পার্লার ইত্যাদি সারা দ্বীপে ছড়িয়ে আছে।

আমরা টুর গাইডের সঙ্গে ওপেন এয়ার বা খোলা রেস্টুরেন্টে এলাম। এখানে বুফে স্টাইলে দুপুরের খাবার দেয়া হলো। এই রেস্টুরেন্টের সব কর্মী হলো মুসলমান। মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ দেয়া। কাজে অসম্ভব চটপটে। এদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম কাছে কোথাও মসজিদ আছে কি না। ইংরেজি খুব ভালো বলতে পারে না। কিন্তু নামাজের ইশারা করতেই দেখিয়ে দিল কাছেই মসজিদ আছে।

ছোট্ট এক তলা বাড়ি, নতুন তৈরি, রঙের গন্ধ এখনো যায়নি।

ওজু করে ভেতরে ঢুকতেই এক বয়স্ক দম্পতির সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রলোক হেসে হাত মেলালেন। আমার ছেলেকে আদর করে ইশারায় জানালেন জোহরের নামাজ পড়ে নিতে।

নামাজ শেষে পুরো দ্বীপটি ঘুরে দেখলাম। পর্যটকদের জন্য সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বিকেলে জাহাজে ফিরে ফুকেটের দিকে যাত্রা শুরু হলো। চা, কফি বিভিন্ন রকমের ফল আমাদের দেয়া হলো ভ্রমণের ক্লান্তি কাটানোর জন্য। সন্ধ্যায় ফুকেট জেটিতে পৌছাতেই দেখলাম ঝকঝকে ফ্লাডলাইট জ্বলছে। পরিষ্কার আলোয় সিড়ি বেয়ে নির্ভয়ে জাহাজ থেকে নেমে দেখি হোটেলে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য গাড়ি তৈরি।

মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে দুটো প্রবাল দ্বীপে ভ্রমণের এ সুযোগে স্বভাবতই অভিজ্ঞতার তুলনা করতে ইচ্ছা করে। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ফি ফি দ্বীপ থেকে কোনো অংশে কম নয়। অপ্রতুল সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রচুর উৎসাহী পর্যটক যাচ্ছেন সেন্ট মার্টিনসের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কিন্তু বিদেশি পর্যটকরা কেন এতো কষ্ট করে ওখানে যাবেন যেখানে ফি ফি দ্বীপ বা ফুকেটে যাবার এতো সুন্দর সব ব্যবস্থা রয়েছে?

থাইল্যান্ডের অর্থনীতির ছয় শতাংশ আসে পর্যটন থেকে। আমাদের আছে পরিশ্রমী মানুষ। অভাব রয়েছে সুন্দর পরিকল্পনার এবং সঠিক নেতৃত্বের। এটা পেলেই বাংলাদেশও পারবে পর্যটন খাতে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতে।

সিংগাপুর থেকে

মালো- এক

– মোহাম্মদ মিনার

এক যুগ আগের কথা। বন্যার ভয়াবহতা না থাকলেও বর্তমান আগ্রাসী ইনডিয়ার ফারাক্কা বাধ তখন খুলে দেয়ার কারণে বিশেষ করে ভৈরব নদী এবং তার আশপাশের খাল, বিল, মাঠ, ঘাট অথই পানিতে ভরপুর। আমাদের মেহেরপুরের কোল ঘেষেই ভৈরব নদী বয়ে চলেছে। নদীর এ কূল ও কূল পানি দেখে কিছু যুবক ছেলেরা প্ল্যান করলাম নৌকা ভ্রমণ এবং সেই সঙ্গে পিকনিকের আয়োজন করলে বেশ ভালো হয়।

যেই ভাবা সেই কাজ। আহসান আলীভাইয়ের মাইক থেকে গ্রামের আগ্রহী সকল ছেলেদের ভ্রমণে অংশ নেয়ার জন্য জানানো হলো। চাদার পরিমাণ একশ টাকা। নির্দিষ্ট তারিখে একেবারে সকাল থেকে আমাদের খায়রুলভাই মাইক মুখে বলা শুরু করেছেন। আমাদের নৌযাত্রা শুরু হবে *মালো–এক* নাম্বার ঘাট থেকে। এখানে বলে রাখা ভালো আমাদের গ্রামের নদীর তীরে যারা বসবাস করে তাদের পাড়াকে *মালো পাড়া* বলা হয়। সে মতে নদীর ওই ঘাটকে মালো ঘাট এবং দুই প্রান্তের দুই ঘাটের দুইটা নৌকার নাম যথাক্রমে *মালো–এক* এবং *মালো–দুই* বলা হয়।

উক্ত ভ্রমণ চালু হবে মালো–এক নাম্বার থেকে। ভ্রমণের একটা শর্ত হচ্ছে, স্রোতের বিপরীতে তিন ঘণ্টা দশ মিনিট নৌকা বাওয়ার পর যেখানে অবস্থান করবে সেটাই হবে পিকনিক স্থান। অনেক সকাল থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। এদিকে খায়রুলভাই মাইক মুখে ঝড় তুলে যাচ্ছেন। পুরো গ্রাম জুড়ে আনন্দ মুখর পরিবেশ। আমিও তখন পোশাক–আশাক পরা নিয়ে ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে সাদেকভাইয়ের ক্লাস এইট পড়ুয়া ছেলে শাহিনের কান্না শুনতে পেলাম। সেই সঙ্গে তার মায়ের চেচামেচি শুনতে পাচ্ছি। একটু কান খাড়া করে যা শুনতে পেলাম তা ঠিক এমন – *তোর মিনারকাকার বাপের টাকা আছে, তাই সে নৌকা ভ্রমণে যাবে, হাটে যাবে, বাজারে যাবে, তাতে তোর বাবার কি? তোর বাবার কি টাকা আছে, তাই তুই কাদলেই আমি টাকা দেবো?*

ছেলেটা এবার কান্নার গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

হঠাৎ আমার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে শাহিনকে বললাম, যাও, পোশাক পরে এসো। টাকা আমি দিচ্ছি।

শাহিনের মা এবার বললেন, ভালো হলো ভাই, তুমি এখন দাও, আমি সময় করে তোমার টাকা দিয়ে দেবো।

একটু মজা করে বললাম, তোমাকে আর দেয়া লাগবে না। ছেলেটা তো আমাদেরই।

শাহিন এবার খুব খুশি। চটপট পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লো।

নির্দিষ্ট সময়েই আমাদের নৌযাত্রা শুরু হলো। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, এবং এবং দশ মিনিট। শর্তানুসারে সময় শেষ। অমনি মালো–এক নাম্বার গতি রুদ্ধ করে কূলে ভেড়ানো হলো। কিন্তু একি! ওই যে ইনডিয়ার বর্ডার পোল দেখা যাচ্ছে! পাচ দশ মিনিট নৌকা চললে আমরা ইনডিয়ার মধ্যে চলে যেতাম। অর্থাৎ আমরা এখন কাথুলি বর্ডারের শেষ প্রান্তে। অল্প সময়ের মধ্যে খুব সুন্দর জায়গা দেখে পিকনিকের কাজ শুরু করে দিলাম।

পুরো দিন মহাধুমধামের মধ্য দিয়ে পিকনিক শেষ করে এবার বাড়ি ফেরার পালা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। স্রোতের অনুকূলে অর্থাৎ গর্জিয়ে ওঠা স্রোতের আগেই কল কল শব্দে ভৈরবের বুক চিয়ে ভেসে চলেছে আমাদের মালো–এক। মাইকে চড়া আওয়াজে সদ্য মুক্তি পাওয়া হিন্দি *সাজন* সিনেমার গান বাজছে। *দেখা হো প্যাহেলি বার, সাজনকা...*। এই গানটির বিশেষ মিউজিকের তালে তালে কেউ বলছে, *ডেটট্যাকা সের,*

ডেটট্যাকা সের। আবার কেউ বলছে, *খ্যাটটা খ্যাটাম, খ্যাটটা খ্যাটাম* ইত্যাদি এমন নানান কথা এবং নাচের মাঝে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সবটুকু সুখ যেন উত্তাল ভৈরবের মাঝে বহমান আমাদের মালো–এক–এর ওপর। কিন্তু তারপর? তারপর হঠাৎ চিৎকার! কারো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মালো–এক–এর এক মাথা উপরের দিকে। এক মাথা ভস করে পানির নিচে। বাচাও, বাচাও আর্তনাদে যেন কম্পিত ভৈরব। নিজের প্রাণ বাচানোর তাগিদে কোনো কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। অনেক কষ্টে সাতরিয়ে এক সময় কূল পেলাম। লক্ষ্য করলাম, বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে সবাই কিনারা পেয়েছে। কিন্তু শাহিনকে দেখছি না কেন?

আমি এখনো শাহিনকে তার পাগলি মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। এখনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে ছবির মতো ভেসে ওঠে সন্তানহারা বেদনায় এক মায়ের আকাশ–বাতাস কাপানো আর্তনাদ। আমার শাহিন কোথায়? শাহিনকে নিয়ে এলি না কেন? এমন নানান প্রশ্নের উত্তর এখনো দিতে পারিনি।

নিরাপত্তাহীন এবং অসাবধানতার দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে নৌ দুর্ঘটনা একটা মামুলি ব্যাপার। *এমভি নাসরিন*–সহ সম্প্রতি প্রতিটা দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় সেই মালো–এক–এর কথা, মনে পড়ে শাহিনের কথা। শুনতে পাই বহু মায়ের দুঃসহ আর্তনাদ।

সাফাত, কুয়েত থেকে

উপহার

– খন্দকার নাজমুল

একদিন বসে আছি ব্রহ্মপুত্র নদের পারে। হঠাৎ ইচ্ছা হলো নৌপথ ভ্রমণের। যা ইচ্ছা তাই কাজ। একটি নৌকা ভাড়া করে নৌকায় এক পা রাখতেই পেছন থেকে আওয়াজ এলো, ভাইয়া, একটু শুনবেন?

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি দুটি মেয়ে।

আমার কাছে এসে একটি মেয়ে বললো, ভাইয়া, আমার নাম তুলি আর ওর নাম সীমা। আমাদের নৌকায় চড়ার খুবই ইচ্ছা। আমরা সাহস পাচ্ছি না। আমাদের সঙ্গে নেবেন?

বললাম, আমি যে নৌকায় অনেকক্ষণ কাটাবো।

তুলি বললো, অসুবিধা নেই।

তাহলে আমারও কোনো আপত্তি নেই।

তিনজন নৌকায় উঠলাম।

মাঝি নৌকা ছাড়লো।

তুলি, সীমা চারদিক তাকিয়ে নদীর দৃশ্যগুলো দেখছে।

আমি বাকা চোখে দেখছি তুলিকে। তুলিকে যতোই দেখছি ততোই যেন ভালো লাগছে। বেশ অনেকক্ষণ পর আমার বাকা চোখে তাকিয়ে থাকা তুলির নজরে পড়লো।

তুলি আমার চোখে চোখ রাখতেই লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললাম।

তুলি বললো, ভাইয়া, আপনার নামটা জানা হলো না।

মাথা উচু করে দেখি তুলি, সীমা মুচকি হাসছে। আমার নাম বললাম।

হঠাৎ তুলি সাপ বলে চিৎকার করে আমার কাছে চলে এলো।

আমাদের নৌকার কাছে মরে থাকা একটি সাপ পানিতে ভাসছিল।

তুলির হাত ধরে বললাম, ভয়ের কিছু নেই, সাপটি মরা।

তুলির হাত ধরাতে অনুভব করলাম, নৌকা ভ্রমণের মতোই আমার মন যেন তুলির মাঝে ভ্রমণ করছে। এভাবে ভাব, অনুভব ও কথার মাঝে অনেকটা সময় কেটে গেল।

আবার হয়েছিল কি, আমাদের নৌকার পাশ দিয়ে একটি ট্রলার যাওয়ায় পানির ঢেউ লেগে নৌকা উচু-নিচু দোল খাওয়াতে সীমা, তুলি দুজনই ভয় পেয়ে গেল।

তুলি বললো, আর নয়, চলুন ফিরে যাই।

নৌকা ঘোরানো হলো।

আমাদের গন্তব্যে এসে পৌছানোর পর তুলি কাশফুল তুলে আমাকে বললো, এই মুহূর্তে আপনাকে উপহার দেয়ার মতো কিছুই নেই। তাই কাশফুলটি যদি নেন তাহলে খুশি হবো।

আমি নিলাম।

তুলি, সীমা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

নন্দিবাড়ি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ থেকে

পারাপার

– মাহবুবুর রহমান

নদী বেষ্টিত রাজধানীর সঙ্গে স্থল যোগাযোগ নদী বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক কালে বৃজ নির্মাণ করা হলেও নৌযান ফেরিই যানবাহন পারাপারের মাধ্যমে স্থলপথের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আসছে। ফেরি নৌযানের সবচেয়ে দীর্ঘ নৌপথ অরিচা থেকে নগরবাড়ি। সময়ের পরিমাপে মরসুম ভেদে আরিচা থেকে নগরবাড়ির দূরত্ব আড়াই থেকে চার ঘণ্টা।

রাজশাহীতে বদলির সুবাদেই আরিচা-নগরবাড়ির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বর্ষা বিদায় নিলেও তার আমেজ তখনো কাটেনি। যাওয়ার সময় সকাল নয়টায় বাস ফেরিতে ওঠার পর পরই সিড়ি বেয়ে সোজা ছাদের ওপর স্থায়ীভাবে পেতে রাখা চেয়ারে আসন নিয়ে টইটম্বুর পদ্মার নয়নাভিরাম যৌবনের সঙ্গে দূরের প্রকৃতি উপভোগ করতেই আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছিল।

মূল ঘটনাটি আনুমানিক মাস তিনেক পর অফিশিয়াল ডাকে ঢাকা আসার সময় ঘটেছিল। শীতকাল। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সে বছর। হিমালয়ের বরফ মাখা পিনপিনে হাওয়া রোদ্দুরকেও যেন উত্তাপহীন করে রেখেছিল। তার উপর সন্ধ্যা না হতেই ঘন কুয়াশার চাদরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে সমস্ত পৃথিবী।

সময় সাশ্রয় করে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন পর আড্ডা দেয়ার কথা ভেবে নাইট কোচেই রাজশাহী থেকে ঢাকা রওনা হয়েছিলাম। কোচটি রাত নয়টায় নগরবাড়ি পৌছালেও কোচের সুপারভাইজার সাড়ে দশটার ফেরিতে যাবার সংবাদ শোনালেন। অথচ প্রচণ্ড ঘন কুয়াশার মধ্যেও ড্রাইভারের বেপরোয়া টান দেখে মনে হয়েছিল সাড়ে আটটার ফেরি ওনার জন্য ভেপু বাজিয়ে অপেক্ষা করছে।

যাহোক, গরম গরম ভাজা চিনাবাদাম, চা, সিগারেট আর পাশের সিটের অভিজ্ঞ সহযাত্রী বন্ধুটির চাপার সান্নিধ্যে সময়টা ভালোই কাটলো।

তারপর তন্দ্রাচ্ছন্ন কোচটি ধীরে ধীরে ফেরিতে উঠলো। সাড়ে দশটার ফেরি হলেও ঘাট ছাড়তে এগারোটা বাজলো। প্রায় সবগুলো কোচের ছাদেই জ্যান্ত মুরগির খাচা থাকায় ফেরি জুড়ে ভোটকা দুর্গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শীতে মুরগিগুলোও *ক্যাক ক্যাক* শব্দ করছে। প্রসঙ্গেক্রমে জানতে পারলাম ফেরি ওপারে পৌছাতে কমপক্ষে চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টা লাগবে। পানি কমে গিয়ে অনেক চর জেগেছে। জাগা ভাব নিয়ে অনেকগুলো জেগে ওঠার অপেক্ষায়। তাই সারেংকে পানি মেপে মেপে অনেক দূর ঘুরে যেতে হবে। অতএব

কনকনে ঠাণ্ডায় বমি বমি ভাব নিয়ে এতোটা লম্বা সময় বসে থাকা অসম্ভব মনে করে পাশের বন্ধুটিসহ ফেরির উপর যাওয়ার সিদ্ধান্তে কোচ থেকে নামতে গিয়ে দেখি দুটো কোচের মাঝখানে যে ফাকটুকু আছে তাতে আমার মতো মাধ্যম কৃতির লোকও সামনের দিকে চলতে পারবে না। এ জন্য অন্যদের মতো অভিযোগ ভেতরে চেপে পাশাপাশি হেটে কোনো মতে ফেরির সিড়িতে পৌছালাম। বাইরে তাকিয়ে কুয়াশা ছাড়া কিছুই অনুমান করার উপায় নেই। উপরে উঠে ভিআইপি ক্যাবিনের খোজ করে জানলাম সব ওস্তাদ (ড্রাইভার)দের দখলে।

পরে সাধারণ শ্রেণীর রুমের দরজা টেনে ককটেল ঝাজের গরম হাওয়ার সঙ্গে ধাক্কা সামলে ভেতরে ঢুকলাম বাংলাদেশের সকল ব্র্যান্ডের বিড়ি–সিগারেটের ধোয়ার সঙ্গে পান, চা, ঝালমুড়ি ও নিঃশ্বাসের গন্ধসহ সেকেন্ডে লক্ষ্য শব্দের ব্যঞ্জনে এক অন্য রকম পরিবেশ। তাশের বিভিন্ন ধরনের জুয়ায় মত্ত অনেকগুলো দল। যৌন শক্তি ও যৌন রোগের প্রাধান্য একশ শতাংশ গ্যারাণ্টিসহ প্রায় সকল রোগের মহৌষধের বিজ্ঞচিত আশ্চর্য ভাষণের ফাকে ফাকে ফকির বাউল শিল্পীদের নতুন অচেনা গানের সুর ঝংকার। সব মিলিয়ে ফেরিটি যেন ফেরিওয়ালাদের জন্য।

এরই মধ্যে নয় দশ বছরের নোংরা একটা ছেলে এসে বললো, মালিশ লাগবো স্যার?

উৎকট গন্ধের মধ্যেও তার শরীরের দুর্গন্ধ আলাদাভাবে লাগছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাতেই আমার সহযাত্রী বন্ধুটি তাকে বললো, লাগবো না।

কথা শেষ না করতেই ছেলেটি বললো, আপনি কন ক্যান। স্যার, আমি খুব ভালো মালিশ করতে পারি, আরাম পাইবেন স্যার ! বলতে বলতে আমার কাধের দিকে সে হাত বাড়ালো।

একটু সরে গিয়ে বললাম, লাগবো না, লাগবো না।

তাহলে একটা টাকা দেন, সন্ধ্যা থেইক্যা কিছুই খাই নাই।

একটা টাকা দিয়ে বললাম, যা।

ছেলেটি যেতেই বন্ধুটি বললো, কি করলেন? ও গিয়ে অন্যদেরকেও বলবে, কতোজনকে দেবেন? এটা এদের ব্যবসা!

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, উদোম শরীরে নবাব ভঙ্গিতে বসা কয়েকজন মালিশ ভোগীর সর্বোচ্চ মালিশ সেবায় নিয়োজিত তারই মতো কয়েকজন মালিশ বালক। হাতের কবজির কসরত আরো কয়েকজন মালিশ বালক পান, সিগারেট বা বাদামওয়ালার মতো *মালিশ, মালিশ* বলে ডাকছে। মনে হলো মালিশ ভোগীদের জন্য এই ফেরি ভাসমান *মালিশ পার্লার।* আশ্চর্য মানুষের আশ্চর্য রুচির বদৌলতে কতো কিছুই না ঘটছে চারদিকে, আমরা তার কতোটুকুই বা জানি? অবশ্য বন্ধুটির কথা সত্য প্রমাণিত করতে মালিশ বিক্রির ছুতোয় আর কেউ টাকা চাইতে আসেনি।

ইতিমধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। হঠাৎ করেই একটা আলতো ঝাকুনি দিয়ে ফেরিটি থেমে গেল। হঠাৎ সবাই ছোটাছুটি করে বাইরে যেতে লাগলো। পদপিষ্ট হওয়ার কথা ভেবে চোখ কান খাড়া করে অনুমানের চেষ্টা করছি।

এমন সময় সুঠাম দেহের একজন হাসি মুখে বিজ্ঞের মতো দাড়িয়ে বললো, ফেরিটা চরে আটকা পড়েছে। সারেংও এতোক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। তাই খামাখা ছোটাছুটি না করে আরামে বসেন। তবে ঘুমাবেন না। কারণ ঘুম থেকে উঠে হয়তো খালি গায়েই কোচে উঠতে হবে। তার চেয়ে বরং কিছু দরকারি কথা শোনেন।

ছোটাছুটির অবসান হলে বাইরে উকি দিয়ে ঘটনার সত্যতায় উপায়ান্তরহীন বসে পড়লাম।

সুঠাম দেহের লোকটি সম্রাট শাহজাহানের দৃঢ় পুরুষত্বের অটুটত্বে পারদ রহস্যের উন্মোচন করছিলেন। শাহজাহান নামেরও কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি ওখানে থাকলে অবশ্যই মানহানির মামলা ঠুকতেন। অতঃপর টিমটিম আগুনে জ্বাল দেয়া হাড়ি থেকে দুটি সিদ্ধ ডিম নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে শাদা অংশ থেকে কুসুম বের করে ফ্রাইপেন জাতীয় একটি পাত্রে নিয়ে পেস্ট বানিয়ে টিমটিমে আগুনের ওপর ধরলেন এবং মুখে পৃথিবীর সকল পুরুষাঙ্গের আকার, আকৃতি, রোগ, চিকিৎসা মাড়িয়ে যৌন মিলনে এসে থামলেন। ইতিমধ্যেই জ্বাল দেয়া ডিমের কুসুম থেকে কিছু তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে যা *ডিমের তৈল* নামে আখ্যায়িত করে হেটে হেটে সবার দৃষ্টিগোচর করান এবং রতি স্থায়ীত্ব দীর্ঘকরণে ডিমের তেলের, বিশেষত চড়ুই ডিমের তেলের ভূমিকা ও ফলাফল বর্ণনা করে ঝুলিতে সংরক্ষিত চড়ুই ডিমের তেল বাম্পার বিক্রি করলেন।

কেনার হিড়িক দেখে মনে হচ্ছিল নপুংসক জাতীয় মহামারী চলছে দেশটাতে। যদিও জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ দেশটির কোমর ভাঙার উপক্রম। তখনো ভায়াগ্রার আবিষ্কার হয়নি। অবশ্য ভায়াগ্রা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত পত্রপত্রিকার বাইরে কিছু জানি না এবং এ পর্যন্ত হাতেও পাইনি। না, খুজছি না। তবে পেলে উপাদানগুলো পরীক্ষা করে চড়ুই ডিমের তেল জাতীয় কোনো উপাদান আছে কি না দেখা যেতো। কিন্তু তার বর্ণনা সত্য হলে চড়ুই ডিমের তেল নিঃসন্দেহে ভায়াগ্রার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী।

ভোর হতে তখনো এক ঘণ্টা বাকি। ক্যান্টিনে খাবার বিক্রির ধুম রমজান মাসের মতো। অগ্রিম পরিশোধিত মাত্র আঠারো টাকায় নামমাত্র সীমিত খাসির মাংসসহ পেট চুক্তি ডালভাত। প্রথম প্লেটে ছিটিয়ে গরম ভাত পরিবেশন করা হলেও চালগুলো ঠাণ্ডা, বাসি ও কংকর মেশানো, গরম ডালেও বাসি গন্ধ। খাবার পানি বলতে বালি থেতানো নদীর ময়লা পানি। খেতে খেতে অশ্রাব্য গালি ঝরিয়ে চলছে ক্রেতা।

বিস্কুটের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত স্প্রাইটে ক্ষিধে তৃষ্ণার মোকাবেলা করে চলছিলাম। ক্যান্টিনে কর্মরত লোকগুলো সম্ভবত বধির অথবা অশ্রাব্য শ্রবণে অভ্যস্ত। তাই তেমন প্রতিবাদও করে না। তবে প্রতিবাদ করলে হয়তো মল্লযুদ্ধও দেখা যেতো।

সকাল হলো। অন্ধকার ভাবটা ক্রমেই আবছা হচ্ছে। ঘণীভূত কুয়াশাগুলো চিনি কণার মতো শূন্যে ভাসছে। চিরচিরে পানিতে ডুবন্ত চরটির ওপর ফেরির পচাত্তর শতাংশ দেখে মনে হয় ফেরির ভারেই ভাসমান চরটি ডুবেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ফেরিটি সারা রাত ধরে মাঝ নদীতে আটকা পড়ে থাকলেও উদ্ধারের জন্য এ পর্যন্ত কেউ-ই আসেনি। ইতিমধ্যে সূর্যের আগ্নেয়রশ্মির আক্রমণে ভাসমান কুয়াশারাও আত্মগোপন করেছে সূর্যাস্তের অপেক্ষায়। আমরা *শাহ মাখদুম* ফেরির ছাদে দাড়িয়ে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে উদ্ধারকারী দল শনাক্তকরণের প্রতিযোগিতায়।

অবশেষে সকল প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে সোয়া নয়টার সময় চারজন আরোহীসহ একটি স্পিডবোট *শাহ আলী* ফেরিটিকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধার করতে এলো। এসেই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ফেরি দুটিতে বেড়ি সংযোগ দিয়ে স্পিডবোট থেকে সিগনাল দিতেই শাহ মাখদুমকে শাহ আলী পেছনের দিকে টেনে দশ মিনিটের মধ্যেই গভীর পানিতে নিয়ে গেল। অমনি শাহ মাখদুম আড়মোড়া ভেঙে চালু হয়ে গেল এবং শাহ আলীর পিছে পিছে এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের ব্যবধানে আরিচা ঘাটে পৌছালে আমার ফেরি ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

রিয়াদ, সউদি আরব থেকে
connecf-mr@hotmail.com

পাট ব্যবসা

– মুক্তা রহমান

আষাঢ় মাস, বাড়ি ছুই ছুই পানি। দাদুর হাজারমণি ধানের নৌকা বোঝাই শুকনো ধান নিয়ে সিলেট থেকে নৌকা যাবে ঢাকার বর্মী বাজারে। সমস্ত আয়োজন শেষে দাদা বিদায় নিতে এসেছেন।

আমি বায়না ধরলাম ঢাকায় যাবো।

স্কুলে গরমের ছুটি।

বাবা থাকেন ঢাকায়।

মা আপত্তি করলেন। দাদা বোঝাতে চেষ্টা করলেন আমি পথে পথে থামবো। পাটের বায়না করবো কতো সময় লাগবে কোনো ঠিক নেই।

কিন্তু আমার কান্নার তোড়ে সব ভেসে গেল।

ফজরের নামাজের পর পরই দাদার হাত ধরে নৌকার ছৈয়ের ওপর উঠে বসলাম। পূর্ব আকাশে রক্তিম সূর্য, পাখির কলকাকলি এবং বিলের পানির কলকল ধ্বনির মাঝে মাঝিদের বৈঠার শব্দ এক অনন্য দৃশ্যের সৃষ্টি করছিল। এ দৃশ্য শুধু অনুভব করা যায় ভাষা দেয়া যায় না। মাঝি–মাল্লা, ব্যবসার কর্মচারী, ম্যানেজার আর আমরা মিলে প্রায় চব্বিশজনের এক দল। নৌকার মাঝে আছে খাওয়া, নাওয়া, নামাজ পড়া, খেলাধুলা, গান শোনাসহ রান্না–বান্নার সমস্ত আয়োজন। বড় নৌকায় আছে চারতলা অষ্ট রঙা পাল। সঙ্গে আছে একটা ছৈ নৌকা আর একটা ডিঙি নৌকা। বড় নৌকা নদীর মাঝামাঝি নোঙ্গর করে, ছোট নৌকা দিয়ে তীরে আসা–যাওয়া করা হয়।

গত তিন চার দিনে সবার সঙ্গে বেশ জানাশোনা হয়েছে। ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ষোল সতেরো বছরের কয়েকজন আমান, জালাল এবং শফিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। সব সময় মজার মজার কাণ্ড করে তাক লাগিয়ে দেয়ার ফন্দি তাদের মাথায়। দাদু এবং ম্যানেজার কদমচাচার রাশভারী চেহারার কারণে সবাই গুটিয়ে থাকে।

পঞ্চম দিনে ম্যানেজার চাচার সঙ্গে আমরা চারজন ছৈয়ের নৌকা করে কয়েকটি গ্রামে ব্যবসার কাজে যাবার অনুমতি পেলাম। প্রথম গ্রামে পা দিয়েই সবার ফুরফুরে মেজাজ। পাটের বেপারীর বাড়ি পৌছে দেখি পাশের বাড়ির এক মাচায় শ শ শশা।

আমানের জিভে জল চুক চুক করে উঠলো। জালালকে খুব করে ধরলো, তোর তো খুব বুদ্ধি, খাওয়ানা দোস্ত।

জালাল একটা মাঝারি আকারের শশা কাপড়ে ঘষে পরিষ্কার করে ধরে বসে থাকলো। কিছুক্ষণ পর গৃহস্থকে আসতে দেখেই বলতে থাকলো, কি সুন্দর ফল, কি মজার ফল, দেখো আমি কেমন করে খাচ্ছি। বলেই জিভ দিয়ে শশার গা চাটতে লাগলো।

গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আরে করেন কি? এগুলো তো ফল না।

ফল না, তবে কি? কেমনে খায়?

অগত্যা গৃহস্থ শশা কেটে আমাদেরকে খেতে দিলেন।

জালালের আবদার, আহা! এতো মজার জিনিস আমার সঙ্গীগোরে খাওয়াইতে পারলাম না।

গৃহস্থ কয়েকটা শশা গামছায় বেধে এগিয়ে দিতে দিতে হাসি মুখে বললেন, নেন সঙ্গীগোরে খাওয়ায়েন।

সারা দিন কয়েকটি গ্রাম ঘুরে কয়েক জায়গায় পাট কেনা হলো। সন্ধ্যা রাতে এক বাড়িতে উঠলাম। পাট কারবারী মুড়ি আর গুড় দিয়ে খাওয়া–দাওয়া সারালেন।

মধ্যরাতে আমান আর শফি ফিশ ফিশ করে বলে উঠলো, তেলের পিঠার গন্ধ।

জালাল একটা কলকে হাতে নিয়ে আমাকে ঠেলতে ঠেলতে রান্নাঘরে নিয়ে গেল এবং বলে উঠলো, আগুন দেন গো মা। বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বললো, মা জননী, এইটা পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র। পিঠা না খাওয়ালেই এ মন্ত্র কাজ করবে।

তাই সকলের ভাগ্যে জুটলো মজার পিঠা।

পরদিন খুব ভোরে নৌকায় বসে হিসাব কষছি। কয়েকজন বৌ-ঝি ঘাটে নামলো কলসে পানি ভরতে। তাদের এক হাতে কাপড় না ভেজানোর প্রয়াসে কাপড় একটু উচুতে তোলা।

তারা তিনজন সুরে সুরে বলে উঠলো, আরেকটু উঠুক, আরেকটু উঠুক।

বৌ-ঝিরা লজ্জা পেয়ে ছুটে পালালো।

একটু পরেই দেখি লাঠি, দা হাতে বিশ ত্রিশজন মানুষ ছুটে আসছে।

আমি তো ভয়ে আধা মরা।

হঠাৎ তারা তিনজন নায়ের ছৈ ধরে টেনে তুলতে লাগলো আর বলতে থাকলো, আরেকটু উঠুক।

লোকজন কাছে এসে বললো, অ-মা, তারা তো নায়ের ছৈ খুলছে।

ওই মিয়ারা, ছৈ খোলেন ক্যান?

আমাদের হাসি মাখা জবাব, পাট ভরতে হবে তো, তাই।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

স্বপ্নের মানুষ

১৯৯৯ সালের ঘটনা। ফুপুর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ যাই। আমার সঙ্গে মা, বাবা এবং আমার বোনরাও থাকে। এখানে বলা উচিত যে, তখন ছিল বর্ষাকাল। আর গ্রামে সাধারণত বর্ষাকালেই বিয়ে হয়ে থাকে। কাজেই নৌকা ছাড়া ফুপুর বাড়িতে যাওয়াই অসম্ভব। তাই নৌকাতেই আমাদের যেতে হবে।

অবশ্য রাজশাহী থেকে বাড়ি পৌছে সরাসরি আমাদের নৌকায় উঠতে হয়নি। একদিন আমরা খালাবাড়ি ছিলাম। তারপর আমরা যাত্রা শুরু করি বিয়েবাড়ির উদ্দেশ্যে। জীবনে প্রথম নৌকায় উঠবো। তাই এক রকম ভয় আর এক রকম আনন্দ নিয়ে নৌকায় বসলাম।

চারদিকে শুধু পানি আর পানি। নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু অবস্থা। তাই নৌকা থেকে পানি ছুতে চাইলাম। কিন্তু আমার মা তা হতে দিলেন না।

যাই হোক। আমরা বিয়েবাড়িতে পৌছালাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। বিয়ের দিনে নাকি ক্যাসেট বাজাতে নেই।

দাদু বললেন, বিয়ের দিনে গান শুনলে মেয়ের মন আরো বেশি খারাপ হয়ে যায়। তাই সেদিন গান শুনতে পারিনি। প্রচণ্ড রাগও হয়েছিল। কিন্তু করার কিছুই ছিল না।

আমরা চলে আসবো এ কারণে দাদু এবং ফুপুরা আমাদের বিদায় জানাতে নৌকার কাছে এলেন। আমরা নৌকায় ওঠার পর তারা সবাই চলে গেলেন। সব বোন মিলে খুব মজা করেছিলাম সেদিন নৌকাতে।

খালাদের সঙ্গে দেখা করে বাসায় চলে আসবো। তাই আবারও যেতে হয়েছিল সেখানে। যেটা বলার জন্য আমার এতো লেখা সেটা হলো আমার খালাতো ভাই।

সে আমাকে পছন্দ করতো তা জানতে পারলাম যখন সে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠিটা অবশ্যই প্রেমের চিঠি। আমি যখন তার উত্তরে সাড়া দিয়েছিলাম তখন সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু দিয়েছিল মাত্র। এ পর্যন্তই শেষ। এরপর আমাদের মধ্যে আর কিছুই হয়নি। কারণ তার পরদিনই আমাদের চলে আসতে হয়েছিল রাজশাহীতে।

সে এখন রাজশাহীতেই লেখাপড়া করছে। তাই এখন আমাদের আর একটা চুমুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, অনেক কিছুই হয়েছে আমাদের। এ জন্য আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কারণ সেদিন যদি বিয়ে বাড়িতে না যেতাম তাহলে হয়তো আমার প্রিয় মানুষটিকে পেতাম না।

আমার জীবনের প্রথম নৌপথ ভ্রমণ করতে গিয়ে আমার স্বপ্নের মানুষটিকে পেয়েছি। তাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসি। তাই আমার প্রচণ্ড রকম ইচ্ছা, দ্বিতীয়বার যখন নৌকায় উঠবো তখন আমার পাশে ভালোবাসার মানুষটি থাকবে। এ ইচ্ছার কথাটা আজও তাকে বলিনি সারপ্রাইজ দেবো বলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী থেকে

কচি মুখের আর্তনাদ

– হারুন–উর–রশীদ বাবুল

না, কোনো শখে ভ্রমণ নয়, ভৌগোলিক অবস্থার কারণে গ্রামের বাড়িতে যেতে হলে লঞ্চে যেতে হয়। যদিও অধুনা বাসে অনেক লোক যাতায়াত করে। সেই ১৯৭৫ সাল থেকে নিয়মিত নৌ ভ্রমণ করি। গ্রামের বাড়ি যেতে হলে সদরঘাট থেকে চাদপুর, রহিমগঞ্জ, শিকারপুর, বানারীপাড়া আরো অনেক ঘাট পেরিয়ে ভান্ডারিয়া লঞ্চঘাট, সে স্থান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে রাজাপুর থানার এক পাখি ডাকা, ছায়া ঘেরা সবুজ গ্রামে পৌছা কম করে হলেও আঠারো ঘণ্টার ভ্রমণ। প্রতিটি ভ্রমণের অনেক স্মৃতি মনের মণিকোঠায় আজও জাগরিত আছে। সেই ব্যাচেলরকালে লঞ্চের স্টিলের ডেকে বিছানার চাদর ফেলে তাশ পেটাতে পেটাতে, গল্প করে বা ঘুমিয়ে বাড়ি ফেরার আনন্দই ছিল আলাদা।

কোরবানির ঈদের সময় ঢাকার সদরঘাট থেকে গ্রামের বাড়িতে যাবার কথা।

এপৃল মাস। ভিড় এড়ানোর জন্য দুই শিশুকন্যাসহ স্ত্রীকে আগেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। ছোট শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে সাগর–১৫ লঞ্চে উঠি। লঞ্চটি বিকাল পাচটায় ভাণ্ডারিয়ার উদ্দেশ্যে সদরঘাট ছেড়ে যায়। বিশাল আকৃতির যানটি ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক যাত্রী নিয়ে চলা শুরু করে। কোথাও জায়গা না পাওয়ায় ঢাকাতে কর্মরত একজন হাই স্কুল শিক্ষককে আমাদের বিছানায় ঠাই দিয়েছি। লঞ্চটি চাদপুর থেকে আরো কিছু যাত্রী তুলে রাত দশটার দিকে বিশাল মেঘনা নদী পাড়ি দেয়।

গল্পগুজবের পালা শেষে রাতের হালকা খাওয়া–দাওয়া করে ঘুমাতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইঞ্জিন রুমের বিকট শব্দে ঘুমানোর চেষ্টা করা খুবই দুষ্কর। রাত প্রায় বারোটায় আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে এক গগনবিদারী শব্দে হতচকিত হয়ে উঠি। কিছু বোঝার আগেই দেখি আমাদের পাশ কেটে যাচ্ছে *আসা–যাওয়া* নামের ঢাকা–পটুয়াখালীগামী অন্য একটা দোতলা লঞ্চ। ওই লঞ্চের ধাক্কায় সাগর–১৫ লঞ্চের সামনের দিকের বাম অংশের দোতলার ডেকের স্টিলের পাত দুমরে মুচড়ে যায়। ফেটে যাওয়া স্টিলের চোখা পাতে তেরো মাস বয়সী সুমি নামের একটি মেয়ের ডান হাত মারাত্মকভাবে জখম হয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ে। টাওয়াল বা শাড়ি প্যাচিয়ে রক্ত বন্ধের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ভাগ্য ভালো বলে বেচে যায় ওই শিশুর কিশোরী খালা ও তার মা।

বিশাল মেঘনার বুকে এক শিশু কন্যার কান্না ও মা–বাবার বিলাপ পরিবেশকে ভারী করে তুলছিল। অবাক ব্যাপার হলো, লঞ্চে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লঞ্চে সামনাসামনি ধাক্কার জন্য

খামখেয়ালিপনা ও বেপেরোয়া চালকরাই দায়ী ছিল বলে সবার ধারণা। গভীর রাতে বিশাল মেঘনা পাড়ি দিয়ে কোনো হাসপাতাল পাওয়া সেও সময়ের ব্যাপার। স্টাফদের প্রতি যাত্রীরা মারমুখী হয়ে ওঠে।

সকাল ছয়টায় লঞ্চটি রহিমগঞ্জ ঘাটে পৌছে। ততোক্ষণে শিশুটির কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। কয়েকজন গণ্যমান্য যাত্রীর মধ্যস্থতায় লঞ্চ কর্তৃপক্ষ শিশুর পিতাকে চিকিৎসার জন্য দশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়।

শিশুর পিতা তাকে নিয়ে জরুরিভাবে বরিশাল মেডিকাল হাসপাতালে যায়।

বাড়ি ফিরে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিজের শিশু কন্যাদের কোলে নিয়ে আদর করি আর বেশি করে ওই ভাগ্যহত শিশুটির দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে থাকি। শিশুটির কচি মুখের আর্তনাদ মন থেকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

কয়েকদিন পরে ঢাকা এসে ইত্তেফাক পত্রিকায় লঞ্চ স্টাফদের দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে চিঠি লিখি। শিশুর ছোট চাচা আমার ঠিকানায় পত্র দিয়ে পত্রিকায় লেখার জন্য ধন্যবাদ জানায়। জানতে পারি যদিও শিশুটি প্রাণে বেচে গেছে তবু ডান হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। বরিশাল থেকে বিমানে করে ঢাকাতে এনেও তার হাতটি বাচানো যায়নি।

শিশুটি এখন ছয় বছরে পা দিয়েছে। সুমিরা এখন মিরপুর এলাকায় থাকে। তার পিতা সিটি কর্পরেশনে কর্মরত এবং গ্রামের বাড়ি ভান্ডারিয়া থানার ধাওয়ায়।

সুমি বেচে থাকবে এক সাগর বেদনার নীল বুক নিয়ে যা মেঘনার অগণিত নীল জলরাশিকে ছাড়িয়ে যাবে।

সুখের স্মৃতির কথা না হয় অন্য একদিন বলা যাবে। ছোট্ট সুমি তুমি এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে বেচে থাকো। হাতের জন্য দুঃখ করো না, প্রাণটা তো বাচাতে পেরেছো! কারণ এ দেশে প্রতি বছর অগণিত সুমিদের লঞ্চের সঙ্গে সলিল সমাধি হয় প্রায়ই।

wel@bdonline.com

তিক্ততা

– মোহাম্মদ মাসুদ রানা

আমাদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর দশমিনা থানায়। ঢাকা থেকে সাধারণত লঞ্চেই আমাদের গ্রামে যেতে হয়। আর এই আসা-যাওয়ায় ঘটে যায় কতো ঘটনা, হয় কতো অম্লমধুর অভিজ্ঞতা!

ঢাকা ফিরছি। জনাকীর্ণ লঞ্চ। এরই মাঝে একে মাড়িয়ে ওকে ঠেলে জীর্ণ বসনে শীর্ণ দেহের ছেলেটি এগোচ্ছে। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ ছাপিয়ে হাক ছাড়ছে, এই চা খাবেন। মাঝে মধ্যে অসহিষ্ণু যাত্রীদের সঙ্গে অভদ্রভাবে তর্কে লিপ্ত হচ্ছে।

ছেলেটি আমার কাছে আসতেই চায়ের অর্ডার দিলাম।

চা আনলো।

ছেলেটিকে কাছে বসালাম। বয়স আট কি নয়।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, বড়দের সঙ্গে এভাবে তর্ক করতে হয় না। মানুষ খারাপ বলবে।

আশ্চর্য! ছেলেটি মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো বসে থাকলো।

আমার ভালো লাগলো। মাথায় আলতো হাত রাখলাম। আর কখনো এমন করবে না, ঠিক আছে?

নত মাথাটা ছেলেটি আলতো করে নাড়ালো।

তোমার বাড়ি কোথায়?

চর কলমী।

মা–বাবা আছে?

মা নেই, বাবা আছে।

বাবা কি করে?

মাছ ধরে। আরেকটা বিয়া করছে হেয়।

তোমাকে খেতে দেয় না?

না, কাম করতে হয়।

আমার মনটা ভিজে গেল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

ছেলেটি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে কেদে ফেললো। দ্রবীভূত কষ্টের ধারা নামে তার দুই চোখে।

হঠাৎ স্যানডো গেঞ্জি পরা দশাসই শরীরের এক লোক ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে বলে উঠলো, *চা বেচা থুইয়্যা ফিলিম করতাছো।* আর চুলের মুঠি ধরেই তাকে আমার সামনে থেকে নিয়ে গেল।

আমার চোখে চারপাশ ঝাপসা হয়ে গেল।

আরেকটি ঘটনা।

লোকটার টিকেট হারিয়ে কাদো কাদা অবস্থা। তন্ন তন্ন করে চারপাশ খুজছেন। গরিব মানুষ, কষ্ট করে ঢাকা বসে টাকা উপার্জন করে বাড়ি ফিরছেন। নির্ধারিত ভাড়ার প্রায় দ্বিগুণ দিয়ে টিকেট কিনেছেন। আবার টিকেট কাটা অসম্ভব।

তার কষ্টটা আমায় ছুয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললাম, চিন্তা করবেন না। লঞ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখি।

লোকটির চোখে মুখে নির্ভরতার ছাপ।

প্রথমে কেরানির সঙ্গে কথা বললাম।

অনেকেই হয়তো জানে, দক্ষিণ অঞ্চলে গমনকারী অধিকাংশ লঞ্চের কেরানিদের ব্যবহার চূড়ান্ত মাত্রায় নিকৃষ্ট। ব্যাপারটা আমারও জানা ছিল। এবং তার কাছ থেকে পেলামও তাই।

শেষে গেলাম লঞ্চে কর্তব্যরত পরিদর্শকের কাছে।

তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানালেন।

তারপর আমার গন্তব্য এসে পড়ি।

লোকটাকে আবার ভরসাহীন ঠেকলো।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নামার আগে আবার কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেলে শেষে আমার কপালে জুটলো *দালাল* উপাধি।

সীমাহীন তিক্ততা নিয়ে নেমে পড়লাম।

শনির আখড়া, গোবিন্দপুর, ঢাকা থেকে

স্বরূপকাঠির পথে

– বি. এইচ জীবন

চাদপুর থেকে বরিশালে স্বরূপকাঠি যাচ্ছিলাম। হয়তো বছর ছয়েক কিংবা সাতেক আগে হবে। তারিখটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না। তবে শীত আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে বসন্তের আগমন ঘটেছিল সেই সময়টায় এটা আমার মনে আছে।

সন্ধ্যা ছয়টায় বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চাদপুর পৌছালাম রাত দশটায়। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা লঞ্চ আসবে বারোটার পর। দুই ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষার পর *জলকপোত* নামের লঞ্চে উঠে পড়লাম। লঞ্চে তেমন একটা ভিড় ছিল না। তারপরও একটি ক্যাবিন পেতে একটু কষ্ট হয়েছিল।

ক্যাবিনে পেয়ে কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করে পত্রিকা পড়তে শুরু করলাম। কারণ দীর্ঘ পাচ ছয় ঘণ্টার যাত্রাপথ পাড়ি দিতে হবে। সঙ্গে কথা বলার মতো কোনো লোক খুজে পেলাম না। আমার পরিচিত তো কেউ নেই এখানে। ক্যাবিনের ভেতরে ভালো না লাগার কারণে বাইরে একটি চেয়ার নিয়ে বসে জ্যোৎস্নাময় রাতে নদীর অপরূপ রূপ দেখছিলাম।

চিকচিক বালুর কণার মতো পানিগুলো যেন লঞ্চের গায়ে এসে দোল দিয়ে যাচ্ছে। যখন আনমনে নদীর এ রূপ দেখছিলাম, এরই মাঝে কখন যে আমার পাশে একজন চেয়ার নিয়ে এসে বসে আমার রাতের নদী দেখার শেয়ার নিচ্ছে তা টের পাইনি। হঠাৎ নড়েচড়ে বসার আওয়াজ পেয়ে নজর দিতেই দেখি অপরূপা এক নারী আমার পাশের চেয়ারে, ঠিক যেন রূপালী চাদ। মায়াবী মুখ। সেই মুহূর্তে আমার খুব ভালো লাগছিল। কি থেকে কি বলি ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমার আবার মেয়েদের সঙ্গে বেশি কথা বলার অভ্যাস তেমন একটা ছিল না। প্রয়োজনের বাইরে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতাম না। মাঝে মধ্যে আমার কলেজের বান্ধবীরা মিলে আমার জেদ কিংবা আমার জড়তা ভাঙনের জন্য আমার সঙ্গে কথা বলতো এবং দীর্ঘক্ষণ বকবক করে চলে যেতো।

এই মুহূর্তে মেয়েটিকে কি বলবো ভেবে যখন অস্থির ঠিক তখনি মেয়েটি আমাকে বললো, আপনার বুঝি ঘুম আসছিল না, তাই নদীকে দেখছিলেন। আপনাকে একটু সঙ্গ দেয়ার জন্য আপনার পাশে এসে বসলাম। কিছু মনে করেননি তো?

মেয়েটির কথাগুলো খুবই ভালো লাগছিল আমার কাছে। প্রতিউত্তরে বললাম, না, কিছু মনে করবো কেন, আমাকে একা দেখে হয়তো আপনি আমাকে সঙ্গ দিতে এলেন, আমি কিছু মনে করে বসে থাকবো, তা হয় না।

এরই মাঝে আমি কোথায় থেকে এসেছি, কোথায় যাবো সব প্রশ্ন করে আমার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে নিয়েছে মেয়েটি। কিন্তু আমি কোনো প্রশ্নই করলাম না। আমার কাছে মনে হয়েছিল এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই আমার কাছে।

সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমাকে বললো, আপনি তো আমার নামটি পর্যন্ত জানতে চাইলেন না। এর কারণ কি?

উত্তরে বলেছিলাম, কি লাভ হবে আপনার নাম জেনে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য ভ্রমণসঙ্গী হয়েছেন। তারপর লক্ষ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন। আপনাকে আর খুজে পাবো না। এই ক্ষণিকের পরিচয়ের মাঝে আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত নয় কি?

মেয়েটি আমাকে বলেছিল, তা জানি না। তবে আমার পরিচয়টুকু আপনাকে জানানো প্রয়োজন। কেননা আপনার পরিচয় আমি জেনেছি। বলে সে বলতে লাগলো, আমি দীপা। ইডেন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। আমার বাবা এতজন সরকারি কর্মকর্তা। একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি।

তারপর দীর্ঘক্ষণ আলাপ হলো দীপার সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালোই লাগছিল যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু দীপাকে বুঝতে দিইনি। মনে হয় এই প্রথম কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণের আলাপ।

চাদ তখন পশ্চিম আকাশে অস্তমিত প্রায়।

যখন এমনটি ভাবছিলাম তখন দীপা বললো, কি ব্যাপার বলুন তো, কিছুই বলছেন না যে! কি এমন ভাবছেন?

না, কিছু না।

আপনি যতোই লুকাচ্ছেন না কেন, বুঝতে পেরেছি কিছু একটা আপনি ভাবছেন। কি ভাবছেন বলুন না প্লিজ! বললাম, দেখুন, আজকের এই ক্ষুদ্র ভ্রমণে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, দীর্ঘক্ষণ আলাপ হলো। আমাদের ক্ষণিকের পরিচয়টুকুকে কি আমরা ধরে রাখতে পারবো? পারবো না। কারণ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি বানারীপাড়া স্টেশনে নেমে পড়বেন, আমি স্বরূপকাঠি নেমে যাবো। তারপর হয়তো আর কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ থাকবে না। এমনকি মনেও থাকবে না স্বল্পকালীন ভ্রমণ সঙ্গীর কথা।

দীপা উত্তর দিল, হয়তো কারো মনে থাকবে আবার কারো মনে থাকবে না, এটাই তো নিয়মের কথা, তাই। পরে দীপা একটি টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বললো, এটা আমাদের বাসার নাম্বার, প্রয়োজনে ফোন করবেন। আমরা সামনের ঘাটে নেমে যাবো। তাই একটু ড্রেস পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে এখন উঠি। এ কথা বলে দীপা চলে গেল তাদের ক্যাবিনে।

আমি বসেই রইলাম চেয়ারে। কিছুক্ষণের মধ্যে দীপা চলে গেল আমাকে একা রেখে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দীপা এসে বললো, জীবন, এবার আসি। অনেক কথা হয়তো বলেছি নিজের অজান্তে। যদি কোনো অপরাধমূলক কথা বলে থাকি তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে নেবেন। আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকবো।

ততোক্ষণে লঞ্চ বানারীপাড়া স্টেশনে থেমেছে। হয় তো দীপার বাবা হবেন, দীপাকে ডাকছেন দীপা, তাড়াতাড়ি আয় মা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দীপা চলে গেল।

আমিও চলে এলাম। যে কয়েকদিন স্বরূপকাঠি ছিলাম শুধু দীপার কথাই মনে ভেসে উঠতো। কোনোভাবেই যেন তাকে ভুলতে পারছিলাম না।

যাহোক, আমি চলে এলাম চাদপুরে। নিজের কাজে মনোনিবেশ করলাম, ব্যস্ততার মাঝে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। দীপার কথা আমার মনে নেই। ঢাকাতে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। কিন্তু দীপার ফোন নাম্বারের কথা আমার মনে পড়ে না।

একদিন এক রাজনৈতিক নেতার ফোন নাম্বার আমার ফোন বুকে খুজতে গিয়ে দেখি দীপার ফোন নাম্বার। সঙ্গে সঙ্গে দীপার বাসায় ফোন করলাম।

দীপাই ফোন রিসিভ করেছিল। আমার পরিচয় দেয়ার পর দীপা আমাকে বললো, ও, এতোদিন পর বুঝি আমার কথা আপনার মনে পড়েছে? এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কেমন আছেন, আপনার তো আমাকে মনে রাখার কথা ছিল না। আমি শিওর ছিলাম, আপনি আমাকে ফোন করবেন। যাক, আমার আশা পূরণ হয়েছে।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ নানান কথা বলে দীপার কাছে থেকে বিদায় নিলাম। এরপর মাঝে মধ্যে দীপার সঙ্গে ফোনে আলাপ হতো।

আমার ভ্রমণ সঙ্গিনী দীপার সঙ্গে আমার শেষ ফোনে কথা হয়েছিল সম্ভব ২০০২-এর জানুয়ারি মাসের কোনো এক তারিখে হবে। কে জানতো, ওই দিনের আলাপই দীপার সঙ্গে আমার শেষ আলাপ!

শেষ দিনের আলাপে দীপা দুটি কথা আমাকে বলেছিল। তা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা জীবনের প্রতিটি সফলতার হাতিয়ার আর সহানুভূতিশীলতা হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী সম্পর্কের প্রধান নির্দেশক। দীপা এ কথাগুলো আমাকে মনে রাখতে বলেছিল, আমিও মনে রেখেছি।

আমি প্রবাসে আসার পর আমার ফোন বুকটি হারিয়ে ফেলেছি। দীপার নাম্বারটাও আমার মনে ছিল না। অনুমান করে কয়েক জায়গায় ডায়াল করেছিলাম। দীপাকে চাওয়া মাত্রই ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসতো, *দীপা নামে কেউ নেই এই বাসায়*। জানি না দীপার সঙ্গে আমার আর কোনোদিন যোগাযোগ হবে কি না। তবে দোয়া করি দীপা যেন সুখে থাকে।

সউদি আরব থেকে
nbbillal@hotmail.com